ডিসেম্বর, ২০২৪

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

POWERED BY
Shalimar's®

শীতের বেড়ানো

২০টি
চেনা-অচেনা
পিকনিক স্পট

টানা গাড়িতে কিংবা ট্রেনে বেড়াতে যাচ্ছেন, গাড়িতে কী খাবেন এমন
একডজন রান্না

ঘুরতে গিয়ে বার্ড ওয়াচিং । শীতের সাজ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন

www.rojkarananya.com

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে গোটা একটি বছর কাটাতে চললাম। বছর শেষে কতটা এগোলাম, নাকি পিছলাম, তার হিসেব ২০২৫-এর জানুয়ারিতেই হোক। তার আগে ডিসেম্বরের ছোট্ট ছুটিতে একটু ঘুরে আসা যাক। পুজোর বেড়ানোর পর তো মাস দুই-আড়াই কাটলো। এর মধ্যে তো বাড়ির বাইরে যাওয়া মানে তো কেবল অফিস যাওয়া। আর কিছুই নয়। একটা বেড়ানো পাওনা হয়ে গেছে। শীত মানেই তো নলেন গুড়, পাটালি, জয়নগরের মোয়া, ফুলকপি ইত্যাদি। বেড়ানোটা তালিকার বাইরে রয়ে গেল। না, না, এসব চলবে না। বাড়ির অন্দরমহলের চাপ আছে। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো ডিসেম্বরের ক্রিসমাসের ছুটিতে ছোটদেরও বায়নাও 'ঘুরতে চলো, কাছাকাছি হলেও যেতে হবে।'

খরচখরচা নিয়ে ভাবছেন? ভাববেন না। আরে মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখার পর কফি-পপকর্ন খাওয়ার চেয়েও কম খরচে বেড়িয়ে আসার খবরাখবর আমরা দিয়েছি এই সংখ্যায়। একবার চোখ বুলিয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

যাঁরা পিকনিকের জন্য তৈরি হচ্ছেন তাঁরাও নিরাশ হবেন না। তাঁদের জন্য গোটা কুড়ি চেনা-অচেনা পিকনিক স্পটের কথাও আছে। যাকে বলে প্যাকেজ। সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকটি রেসিপি। টানা গাড়িতে যান বা ট্রেনে, কী খাবেন না খাবেন তার রেসিপি রয়েছে। বাইরের খাবার খেয়ে শরীর খারাপ করার তো কোনও অর্থ নেই। বাইরের খাবার খেলেই যে শরীর খারাপ হবে তা নয়, হতেও তো পারে। তাই আগাম সতর্কতা। এছাড়াও শীতের ফ্যাশন। সঙ্গে বাড়তি বোনাস বেড়াতে বেরিয়ে বার্ড ওয়াচিং।

সকলকে ধন্যবাদ। নতুন বছরের জন্য পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা সকলকেই পত্রিকার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। নতুন বছর ২০২৫ ভাল কাটুক। সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় থাকুক।

ধন্যবাদান্তে

সম্পাদক

আমার শীতের সঙ্গী

Ayurvedic
Moisturizing
Body Oil

100% Pure
Edible
Coconut Oil

TSP/SCWPL-P-22-B

শালিমার®

নারকোল তেল • বডি অয়েল

শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯২ ই, আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭

অনন্যা পরিবার

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkaranonya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অরূপ ঘোষ ও সুতপা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBEN/2016/64960

স্বত্বাধিকারী: অরূপ ঘোষ ও সুতপা ঘোষ
এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না
ডিসেম্বর ২০২৪

শীতের বেড়ানো আশপাশে
কমলেন্দু সরকার ৬

২০টি চেনা-অচেনা পিকনিক স্পট ৪৭

অমলকান্ত শোভা নিয়ে মুরগুমা দরিয়ার হাতছানি মধুছন্দা মিত্র ঘোষ ৬১

বিয়ের সাজে সীমাহীন বৈচিত্র
এলিজা ৬৬

রান্না ৭১
পথে যেতে যেতে (ঘুরতে গেলে সঙ্গে কী নেবেন এমন একডজন রান্না)

পাখিদের সন্তানস্নেহ আবীর গুপ্ত ৮৯

ছোটখাটো চেঞ্জ এর বড় ইমপ্যাক্ট
এলিজা ৯৪

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কমলেন্দু সরকার

শীতের বেড়ানো আশপাশে

পুজো আর বড়দিন উপলক্ষে বাঙালির বেড়ানো একেবারে বাঁধা রুটিন। পুজোর দূরে কোথাও। উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল বা কুমায়ুন, নইলে হিমাচল। অনেকেই আবার মরুভূমির টানে পাড়ি দেন রাজস্থান। অনেকদিনের ইচ্ছা ‘সোনার কেল্লা’ দেখে সাম বা খুরি গিয়ে মরুভূমির জাহাজ চেপে মরু-সাফারি। সে যাইহোক, শীতের বেড়ানো আশপাশে কাছেপিঠে ফিরে আবার চড়ুইভাতি। বাঙালি ভ্রমণপিয়াসীদের কিছু আগাম ঠিকানা দিলেন কমলেন্দু সরকার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Trusted Since
1864

RIGHT CHOICE PRICE

Shaadi Matlab | tbz®

The original since 1864

GET 100%

value on exchange of any old gold bought from any jeweller*

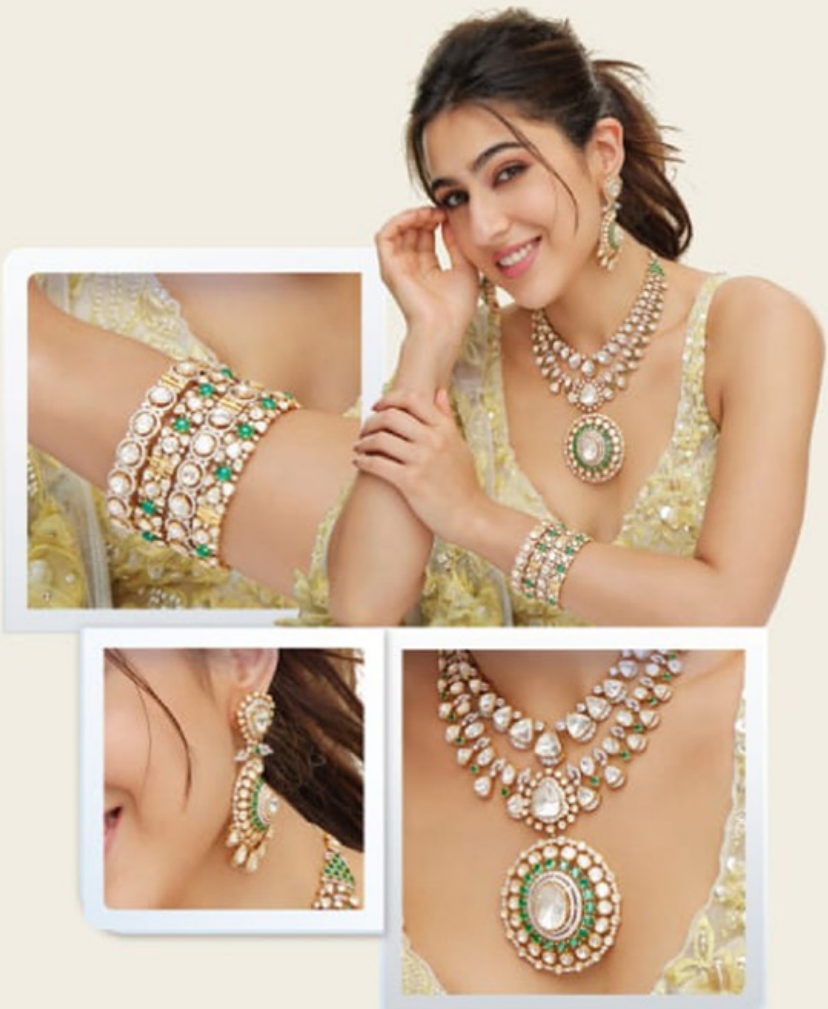

*Conditions Apply

KOLKATA:

5, CAMAC STREET, NEAR THEATRE ROAD (033 40064905)
NEAR PANTALOONS, KANKURGACHI (033 40052214/15/16)

For franchise inquiry, please call on 9158635000 or send email on franchisee@tbzoriginal.com

tbz®
The original since 1864

১। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে মুর্শিদাবাদে

আচ্ছা, এবার একটু অন্যরকম হতে পারে কি ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে আরও একবার দেখে নেওয়া পারে। তাহলে কোথায়! কেন মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ মানেই আমবাগান। পলাশীর প্রান্তর। ইংরেজের সঙ্গে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের লড়াই। চোখের সামনে ভেসে হাজারদুয়ারি। মুর্শিদাবাদের সেরা দর্শনীয় স্থান। প্রায় একচল্লিশ একর জায়গা নিয়ে বিশাল এই প্রাসাদ। যার স্থাপত্যে দেখা যায় ইতালীয় আর গ্রিক স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব। এটি নির্মাণ করেছিলেন মীর জাফরের বংশধর নবাব নাজিম হুমায়ুন জাহ। ইনি ছিলেন বাংলা, বিহার, ওড়িশার নবাব। হাজারদুয়ারির পূর্ব পরিচিতি ছিল বড়া কোঠি। অনেকেই মনে করেন এটি সিরাজের আমলের। একেবারেই নয়, অনেক পরে উনিশ শতকে নির্মিত। হঠাৎ একটা প্রসাদের নাম হাজারদুয়ারি কেন? মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। যদিও এখন প্রায় সকলেরই জানা কেন হাজারদুয়ারি। তবুও একবার ঝালিয়ে নিলে কোনও অসুবিধা নেই তো! এই প্রাসাদে হাজারটি দরজা। ন'শোটি আসল, একশোটি নকল। আসলে বহিরাগতদের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য একশোটি নকল দরজা বানানো। ভিতরে রয়েছে ১১৪টি ঘর, আটটি গ্যালারি। ভিতরটি অরণ্যদেবের গুহা। বিস্মিত হতে হয় সিরাজের তরবারি দেখলে। সিরাজের ব্যবহৃত আরও কত কী আছে! আগেভাগে বলে দিলে চমক থাকবে না। তাই উহ্য থাক। কতশত চিত্রকলা! এমন পেন্টিংস এখানে যা সারা পৃথিবী ঢুঁড়লেও মিলবে না। সেইসব চিত্রকলা চাক্ষুষ করা চাড্ডিখানি কথা! ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকা।

হাজারদুয়ারি ছেড়ে সিরাজের প্রাসাদ খুঁজছেন? না, পাবেন না। হীরাঝিল প্রাসাদ বা মনসুর গঞ্জ প্রাসাদ এখন

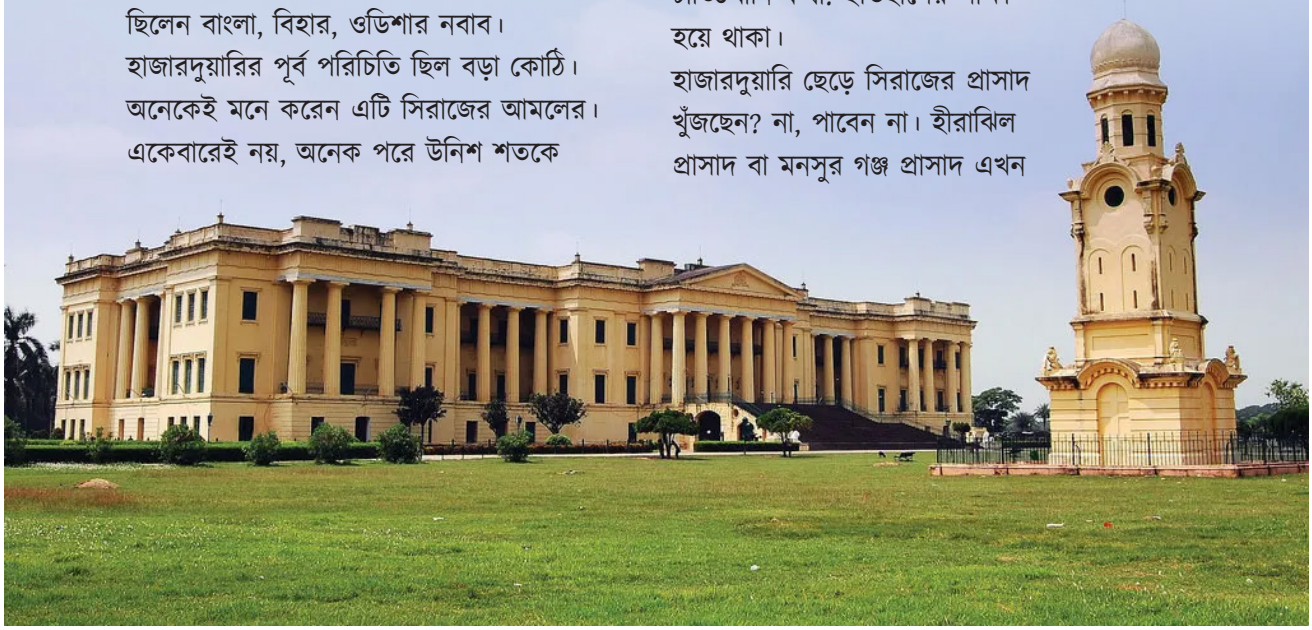

বিলীন। প্রাসাদের ভগ্নস্তূপের কিছু অংশ উঁকি দিলেও বাকি সব ভাগীরথীর গর্ভে। শোনা যায়, সিরাজের পরাজয় এবং ধরা পড়ে যাওয়ার পর থেকেই নাকি তাঁর স্মৃতি নষ্ট করার জন্য তৎকালীন অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন। প্যালেসের প্রধান যে-অংশ তা বহুকাল আগেই ভেঙে পড়ে। কেন? এই জিজ্ঞাস্য তো ছিলই। সিরাজ পরবর্তী নবাবদের কেউই চাননি সিরাজের প্রিয় প্রাসাদ অটুট থাকুক। সাধারণ মানুষের মনে অটুট থাকুক সিরাজের স্মৃতি। শোনা যায়, রাতের গভীরে প্যালেসের ভিতের মাটি কেটে তুলে নেওয়া হয়। যা হওয়ার তাইই হয় হীরাঝিল কিংবা মনসুর গঞ্জ প্রাসাদ ভেঙে পড়ে তাসের বাড়ির মতো। বিশাল একটা চলে যায় ভাগীরথীর অতলে। অনেকটা অংশই বাঁশবন। মনে করা হয়, বাঁশবনের পুরোটাই নাকি ছিল এনতাজ মহল-এর অংশ।

হীরাঝিল বা মনসুর গঞ্জ প্যালেস যখন তৈরি হয় তখন সিংহাসনে সিরাজের দাদু নবাব আলীবর্দী। আদরের নাতির জন্যই তিনি বানিয়েছিলেন এই প্রাসাদ। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই প্রাসাদটিতে ছিল তিনটি মহল--- দরবার মহল, এনতাজ মহল আর রংমহল। পলাশি যুদ্ধে পরাজয়ের পরই হীরাঝিল থেকে নৌকায় সিরাজ পাড়ি দেন রাজমহলের উদ্দেশে। কিন্তু না, সফল হল না সিরাজের পরিকল্পনা। মীরজাফর বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন সিরাজ।

হাজারদুয়ারির বিপরীতে ভাগীরথীর ধারে নিজামত ইমামবাড়া। সিরাজের তৈরি কাঠের ইমামবাড়া

M.P. GOVT. EMPORIUM

Mrignayani® | Avanti

Dakshinapan, Dhakuria Ph.: 24236715

Uttarapan, Ultadanga Ph.: 23550666

Video Call:
7439612704

আগুনে পুড়ে যায়। তারপর বাংলা, বিহার, ওড়িশার শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলি খাঁ যিনি পরিচিত ছিলেন ফেরাদুন জা নামেই। ১৮৪৭-এ সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশাল নিজামত ইমামবাড়াটি নির্মান করেন। এর স্থাপত্যটি চমৎকার। নিজামত ইমামবাড়াটি বাংলা তো বটেই দেশের সবচেয়ে বড় ইমামবাড়া। প্রতি বছর মহরম উপলক্ষে বিশাল মেলা বসে।

হাজারদুয়ারি থেকে প্রায় হাঁটাপথ কাঠগোলা। অদ্ভুত নাম-- কাঠগোলা! শোনা যায়, কাঠগোলাপ থেকে এই নাম। একদা এখানে গোলাপ ফুটত প্রচুর। ১৮৭৩-এ দুগার ভাইয়েরা অর্থাৎ ধনপত সিং আর লক্ষ্মীপত সিং নির্মাণ করেছিলেন এই প্যালেস। এই প্রাসাদটিতে লক্ষ করা যায় স্থাপত্যশৈলী এবং শিল্পের সংমিশ্রণ। নির্মাণের পিছনে ছিল এক ফরাসি এবং এক বাঙালি স্থপতির নির্মাণ-মস্তিষ্ক। এখানে রয়েছে জৈন এবং হিন্দু মন্দির। এই প্রাসাদ বহু ইতিহাসের সাক্ষীও।

এবার যাওয়া যাক নশিপুর রাজবাড়ি। আমাদের কাছে মুর্শিদাবাদ মানেই সিরাজের জায়গা। অনেকের কাছেই জ্ঞাত নয় নশিপুর রাজবাড়ির কথা। এই রাজবংশের পত্তন করেছিলেন রাজা দেবী সিংহ। নবাবি আমলের অবসান এবং ব্রিটিশ শাসনকালে যাঁরা জমিদারিত্ব লাভ করেছিলেন তাদের অন্যতম একজন রাজা দেবী সিংহ। ইনি ছিলেন এক ভয়ংকর অত্যাচারী রাজা। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন পানিপথের কাছে এক গ্রামের বাসিন্দা। সেই পানিপথ ছেড়ে মুর্শিদাবাদ চলে আসেন দেবী সিংহের বাবা। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি অঞ্চলে ওঠেন। সেইসময় মুর্শিদাবাদ ছিল বাণিজ্য নগরী।

দেবী সিংহ ব্রিটিশদের আনুগত্যে কাজ পেয়েছিলেন ট্যাক্স কালেক্টরের। সেই কাজে তিনি দেখিয়েছিলেন মুনশিয়ানা। গরিব মানুষের ওপর অত্যাচার অবিচার করে বহুল পরিমাণে বাড়িয়েছিলেন খাজনা আদায়। যাঁরা খাজনা দিতে পারতেন না তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হত। সেই ফাঁসিঘর আজও রয়েছে নশিপুর রাজবাড়িতে। যেখানে ফাঁসি দেওয়া হত তার নীচে ছিল সুড়ঙ্গ। তার সঙ্গে যোগ ছিল ভাগীরথীর। ওই সুড়ঙ্গ পথে ভাসিয়ে দেওয়া হত ফাঁসি দেওয়া প্রজাকে।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজের সুনজরে পড়ে 'মহারাজা' উপাধিও পান তিনি।

রাজা দেবী সিংহের সন্তান না-থাকার কারণে ভাইপোকে দত্তক নেন। দেবী সিংহের এই দত্তকপুত্র পূর্বপুরুষের পাপস্খলনের জন্য প্যালেসের ভিতর বহু ঠাকুরদেবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সময়ের কালে প্রায় ধ্বংসের মুখে জরাজীর্ণ দশা হয়েছিল নশিপুর রাজবাড়ির। বর্তমানে সংস্কারের ফলে, আড়াইশো পেরোনো রাজবাড়ি তার জীর্ণ দশা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কাটিয়ে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। তবে রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে হয় কিছু অর্থের বিনিময়ে। গেটের কাছেই গাইড থাকেন। তিনিই ঘুরিয়ে দেখাবেন সবকিছু সঙ্গে উপরি পাওনা তাঁর মুখে নশিপুর রাজবাড়ির ইতিহাস।

কাছেই কাটরা মসজিদ। বহু পুরনো এবং অতিপরিচিত মসজিদ। কাটরা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। সময়টা ১৭২৩-২৪। তবে এই কাটরা মসজিদ নির্মাণের পর খুব বেশিদিন বাঁচেননি মুর্শিদকুলি খান। তাঁর ইচ্ছামতো তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় সিঁড়ির নীচে। কেননা, তিনি মনে করতেন তাঁর সমাধির ওপর দিয়ে মানুষ যাতায়াত করুক। মানুষের পদধূলি পড়ুক। এই মসজিদে একসঙ্গে একইসময়ে দু'হাজার মানুষ নমাজ পড়তে পারেন।

শোনা যায়, কাটরা মসজিদ রক্ষার্থে এখানে একটা ছোট দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। এখানেই ছিল তোপখানা। ছিল জাহানকোষা কামান। তৈরি হয়েছিল ঢাকায়। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে কামানটি তৈরি করেন এক বাঙালি কারিগর। তাঁর নাম জনার্দন কর্মকার। স্থানীয়দের কাছে কামানটি অত্যন্ত পবিত্র।

কাছেই নিমকহারাম দেউড়ি বা জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। এটি ছিল মিরজাফরের প্রাসাদ তাই বলা হয় নিমকহারাম দেউড়ি। কিছুটা দূরেই মীরজাফরের পরিবারের সমাধিক্ষেত্র। একসময় নাকি এখানে ছিল বিশাল বাগান। এই জাফরগঞ্জ সমাধিক্ষেত্রের অনতিদূরেই মুর্শিদকুলি খানের কন্যা আজিমুন্নেশার সমাধি। লোকশ্রুতি আছে, আজিমুন্নেশা নাকি এক পুরুষে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর প্রতিরাতে প্রয়োজন হত একাধিক পুরুষের। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন ফুরোলেই প্রতিটি পুরুষকে হত্যা করা হত। তাঁর এই কুৎসিত যাপনচিত্রের জন্য তাঁকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। পিতা মুর্শিদকুলি খানের মতো কন্যা আজিমুন্নশার সমাধির ওপর দিয়েও মানুষ চলাফেরা করেন। এখানেও নাকি মসজিদ গড়ে উঠেছিল। তবে সেই মসজিদ না-থাকলেও, রয়ে গেছে সমাধিটি।

নবাব আলিবর্দির কন্যা ঘসেটি বেগম। তিনিই খনন করিয়েছিলেন মোতিঝিল। এই ঝিলে মুক্তো পাওয়া যেত। তাই মোতিঝিল। এখানেই ছিল তাঁর প্রাসাদ। পলাশি যুদ্ধের পর গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশদের রেসিডেন্সি। তাহলে ঘসেটি বেগম! তাঁকে মীরজাফর অন্তরিন করে রেখেছিলেন ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে। কারণ, ঘসেটি বেগমকে মীরজাফর মনে করতেন বিপজ্জনক এক শত্রু। মীরজাফর-পুত্র মীরন তাঁকে মুর্শিদাবাদ আসার আদেশ করলে, ফেরার পথে বুড়িগঙ্গা নদীতে ঘসেটি বেগমের সলিলসমাধি ঘটে। ঘসেটি বেগমের প্রাসাদ ঘিরে বহু জনশ্রুতি চালু। এখানেই নাকি লুকনো ছিল ঘসেটি বেগমের বিপুল

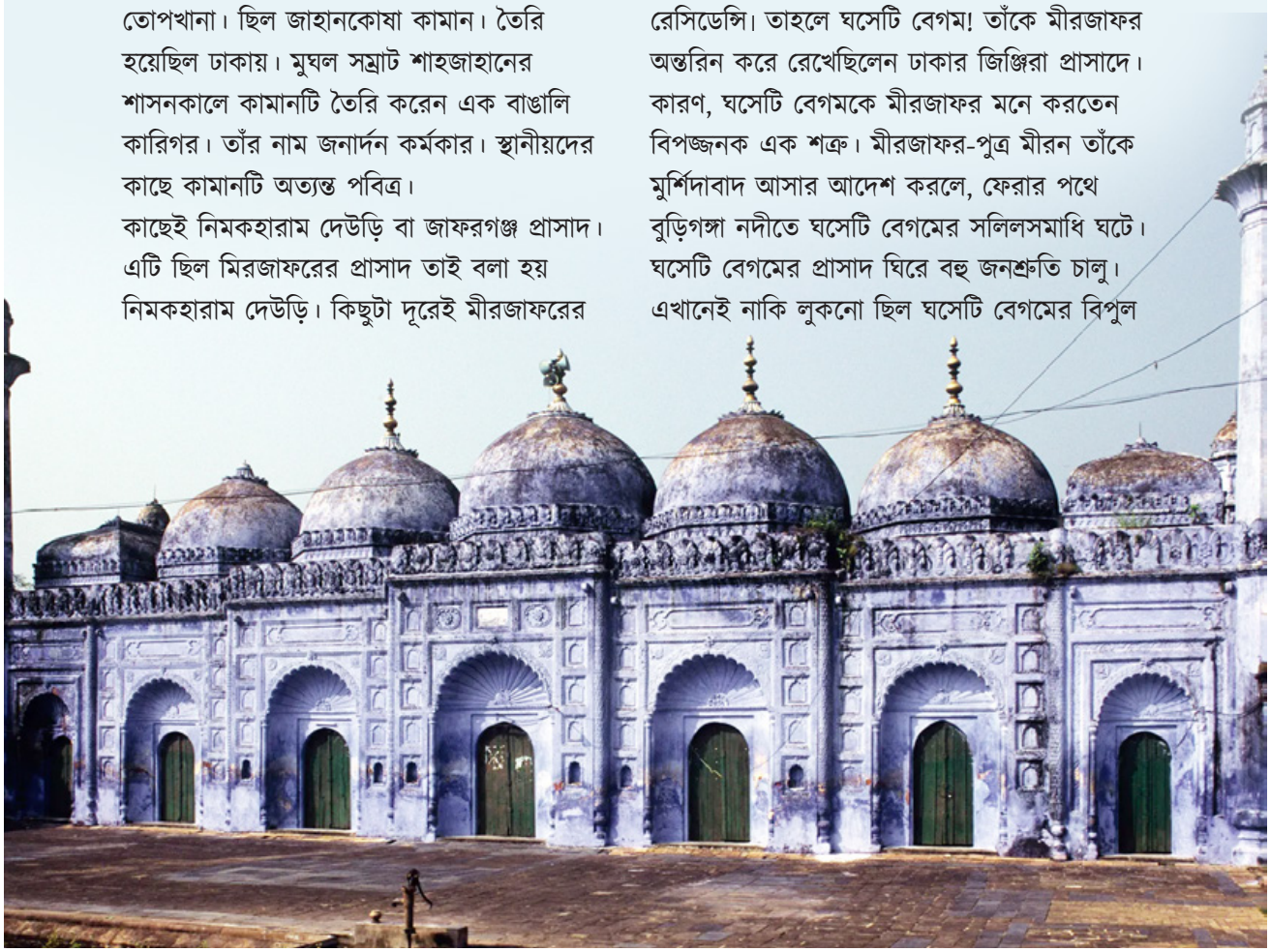

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর ▪ Ph : 2583-6149 / 2523-5588

E-mail : adircpl@gmail.com

For Online Shopping

CALL US AT
9830117563 | 7003384398

VISIT AT
www.adireadymadecentre.net

FOLLOW US ON

ধনরত্ন। যাঁরাই নাকি ধন-রত্নের খোঁজে তাঁরাই মারা গেছেন।

মুর্শিদাবাদে রয়েছে দর্শনীয় বহুকিছু। আছে খোসবাগ, রোশনিবাগ, ডাহাপাড়া গ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে একটি জায়গার কথা সবিস্তারে না-বললে অনেকটাই না-বলা থেকে যায়। তা হল কিরীটেশ্বরী মন্দির। একান্ন পীঠের এক পীঠ। অনেকের মতে, এটি উপপীঠ। কারণ, এখানে দেবীর শরীরের কোনও অংশ এখানে পড়েনি। পতিত হয়েছিল দেবীর মুকুট। যাইহোক, ৫১ পীঠের একটি কিরীটেশ্বরী।

কিরীটেশ্বরী দেবী খুবই জাগ্রতা। জনশ্রুতি রয়েছে, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মীরজাফর মুক্তির আশায় প্রতিদিন দেবীর চরণামৃত পান করতেন। যাইহোক, দেবীকে ঘিরে বহু অলৌকিক ঘটনা শোনা যায় স্থানীয়দের কাছে। কিরীটেশ্বরী দেবীর শিলাময় মূর্তি লাল কাপড়ে ঢাকা থাকে। তবে দুর্গাষ্টমীর দিন শাস্ত্রীয়প্রথা মেনে দেবীকে স্নান করানো হয়। তারপর নতুন কাপড় দিয়ে আবার ঢাকা দেওয়া হয়ে থাকে।

দেবীর নাম কিরীটেশ্বরী হলেও সকলের কাছে তিনি মা বিমলা। ভৈরব সংবর্ত। প্রতি অমাবস্যায় মা বিমলাকে স্নান করানো হয় পঞ্চগন্ধে অর্থাৎ জবাকুসুম তেল, অগরু, ওডিকলোন, কেওড়া আর গোলাপজলে। সঙ্গে থাকে নারিকেল জল, মধু আর দুধ। এরপর নতুন গামছা দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সুগন্ধী আতর মাখিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। সঙ্গে ওড়না আর ফুলের মালাও থাকে। মাকে নিত্যভোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

দর্পনারায়ণ ছিলেন ভগবান রায়ের বংশধর। দর্পনারায়ণ মুঘল সম্রাট অওরঙ্গজেবের কাছ থেকে কানুনগোর পদ পাওয়ার পর জঙ্গল সাফ করে নতুন মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের পাশে একটি দিঘি খনন করিয়েছিলেন। যার নাম কালীসাগর। কয়েকটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। পুরনো কিরীটেশ্বরী মন্দির ছিল দক্ষিণদ্বারী, দর্পনারায়ণ করেছিলেন পশ্চিমদ্বারী মন্দির। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র শিবনারায়ণ সংস্কার করেছিলেন মন্দিরের।

পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এখানে মেলা বসে। যে-মেলার সূচনা করেছিলেন রাজা দর্পনারায়ণ। বহু মানুষের সমাগম ঘটে এই মেলায়। চারিদিকে দোকানপাট ভরে ওঠে। সে এক চমৎকার দৃশ্য। বহু বাউল, ফকির আসেন এই মেলায়। বহু সন্ন্যাসী, বহু মুক্তিকামী মানুষ আসেন দেবীর কাছে। মা কিরীটেশ্বরী ভক্তের কথা শোনেন এবং মনোবাঞ্ছা পূরণও করেন।

ইতিহাসের মুর্শিদাবাদ দেখার পর ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান দেখে বাড়ি ফেরা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

২। মেঘের আদরে রোম্যান্স

মেঘের আদর খেয়েছেন কোনওদিন! খাননি। হয়তো খেয়েছেন। কিন্তু আনখশির আদর? অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমনটাই পাবেন যদি কন্যম আসেন। নাম শুনে দক্ষিণের কোনও জায়গা ঠাওরেছেন। না, দক্ষিণ ভারতে নয়। কন্যম পূর্ব নেপালের চা-বাগানের ভিতর ছোট্ট নিরিবিলি এক পাহাড়ি জায়গা। ভাবছেন নেপাল সে তো অনেকটা পথ। একেবারেই নয়। দমদম বিমানবন্দর থেকে বাগডোগরা হয়ে কন্যম পৌঁছতে লাগবে মাত্র ঘণ্টা চার-পাঁচ।

ভোরবেলা হোটেল-ঘরের দরজা খুলতেই পুব আকাশের লাল আভা ছড়িয়ে ফেলল দরজা ঠেলেই। অনুমতির তোয়াক্কা না-করেই। তার কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের নীচ থেকে মেঘ তার শাড়ি মেলে দিতে দিতে উঠে আসে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা অতিথিদের সোহাগে ভরিয়ে দেয়! তখন সারা শরীরে জড়িয়ে মেঘের আদর। এমন আদর পেতে হলে আসতেই হবে কন্যম। শুধু কী মেঘের আদর! কতশত পাহাড়ি পক্ষীর ডেকে যাওয়া। তারা তো ঘুম আঙাতে আসে কন্যমের অতিথি অভ্যাগতদের। কত গান গায় তারা। পাখির ডাকের কত রকমফের

MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING | RUBIA
DRESS MATERIAL & BED SHEETS

Bhaskar Sriniketan

STORE ‣ BEHALA

+(91)-89103 75304/89103 86709 www.bhaskarsriniketan.com bhaskarsriniketanbehala

আছে তা কন্যমের ভোরে না-উঠলে বুঝতুম না। হোটেলের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনভুলানো অপূর্ব এক সূর্যোদয় দেখলাম। সূর্যোদয় থাকলে সূর্যাস্তও তো থাকতে হবে। আছেও। ওই ব্যালকনি থেকেই দৃষ্টি আটকে যায় অস্ত-সূর্যের আকাশ-ছড়ানো সিঁদুরে মেঘে। মেঘের ভিতর রং আটকে রয়েছে। মনে কোনও শিল্পী বুঝি রং নিয়ে তৈরি ছবি আঁকার অপেক্ষায়। আসলে অপেক্ষায় রয়েছে সেই মানুষটি যে আকাশের পট পরিবর্তন দেখতে দেখতে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে পাহাড়ের খাঁজে মেঘের দিকে!

হোটেল থেকে কিছুটা দূরেই আছে লাভ পয়েন্ট। দুটো লাভই আছে এখানে। চা-বাগানের ভিতর ভয়ংকর চমৎকার এক জায়গা। এখানে প্রেমিক-প্রমিকারা আসে। মজা করে। সেলফি তোলে। তার মানে এই নয় যে কাবাব মে হাড্ডি হতে যেতে মানা। তা নয়, সবাইকে স্বাগত জানাতে লাভ পয়েন্ট তৈরি। এখানে এলে বাংলা ইংরেজি দুটো লাভই হয়। বাংলার লাভ হল-- মানসিক লাভ। চারিদিকে শুধুই চা-বাগান। আশপাশে পাহাড়। মিঠেকড়া ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়। সেই বাতাসে বয়ে আসে মেঘ। মেঘ নেমে আসে শরীরে জড়িয়ে ধরে। ভালবাসে আদর করে। যেমনটি করছে চ-বাগানে ডুবে-যাওয়া দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে। এ হল ইংরেজির লাভ।

কন্যমের চা-বাগানের ভিতর এই লাভ পয়েন্টে নেপালের সমস্ত জায়গা থেকে যুবক-যুবতীরা আসে। তারা নেপালি কিংবা শেরপার সাজে ছবি তোলে। না, বাইরের কোনও ফোটোগ্রাফারের ঝামেলা নেই। কেউ-বা প্রেমিকাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে ছবি তুলছে, আবার কেউ-বা প্রেমিককে। চমৎকার পরিবেশ লাভ পয়েন্টের। রাস্তা জুড়ে অজস্র ভিউ পয়েন্ট রয়েছে কন্যমে। চারিদিকে শুধুই চা-বাগান আর পাইনের সারি। অপলক মুগ্ধতায় ডুবে যেতে কল্পলোকে। প্রকৃতির মাঝে কল্পনা এসে ভিড় করে অখেয়ালেই!

কিছুটা দূরেই ফিক্কল বাজার। পাহাড়ি পথের ধারে এক চিলতে বাজার। এখানে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে নেপালে তৈরি জিনিসও পাবেন। বিশেষ করে, স্থানীয়দের হাতে তৈরি চকোলেট। তার স্বাদ লা-জবাব! সামান্য দাম। যে-কোনও নামী কোম্পানির চকোলেটকে গুনে গুনে দশ গোল দেবে। এই চকোলেট লাভ পয়েন্টেও পাওয়া যায়। প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা এই চকোলেট দিয়ে ভালবাসা নিবেদন করে। হ্যাঁ, বয়স্করাও যান এবং চকোলেট খান প্রাণভরে।

পরের দিন ভোরের বেলা পাহাড়মুখী ঝুল বারান্দার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দরজা খুলতেই দেখি রাতের মেঘ ভোরের অভিবাদন জানার জন্য অপেক্ষায়। পাহাড়ি মেঘে কুচি কুচি জল থাকে। তার কোমল পরশে এক অলৌকিক অনুভূতি পাই ঘুম-ভাঙা চোখে। কেমন যেন রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যায় কন্যমের ভোর! কন্যম থেকে ঘণ্টা দেড়েকের পথ ইলম। পাহাড়ি পথ যেমন হয়, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যাওয়া। গাড়ি যখন হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন মনে হল এ কোন জায়গায় এলাম! পাহাড়ি শহর যেমন হয়, তেমনই। চমক যে অপেক্ষা করে ছিল, তা বুঝলাম দুপুরের ভোজনের পর। হোটেলের পিছনের রাস্তায় পড়তেই অস্ফুটে 'আঃ' শব্দটি বেরিয়ে এল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চা-বাগান নেমে গেছে। চারপাশে শুধুই চা-বাগানের সবুজ! আর তারই ফাঁকে উঁকি মারে পাইনের সারি। উঁকি মারে আরও নাম না-জানি পাহাড়ি গাছ। তবে শিহরিত করল ইলমের চা-বাগান পেরিয়ে ভালুকডাঙা যাওয়ার পথ! একেবারে ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে চড়াই-উতরাই পথ। এমনই চড়াই কয়েক জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হচ্ছে। গাড়ি ওঠে না। যাইহোক, এই করতে করতে পৌঁছনো গেল ভালুকডাঙা। চারিদিকে চোখ মেললেই ঘন জঙ্গল। আর পাহাড়। দূরে কোথাও কোথাও বাড়িও চোখে পড়ে। দেখলাম ইলমের সংস্কৃত ইস্কুল। যেখানে শুধুই সংস্কৃত শিখতে আসে সবাই। সিঁড়ি বেয়ে কিংবা মেঠো পথে নামা নীচে। অরণ্যের অন্ধকার গ্রাস করেছে সেখানে। গা-ছমছমে ব্যাপার! একসময় এখানে বাস ছিল ভালুকের। এখন নেই। ভালুকডাঙা ছেড়ে আসতে মন চায় না। দু'চারজন সেখানেই বসে আছে সারাদিন। চললাম অন্য কোনওখানে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছলাম ছিয়াবাড়ি কটেজ। অপূর্ব! চারিপাশে চা-বাগান আর চা-বাগান! তারই মাঝে কালো ফিতের রাস্তা। কটেজ আর পাকাবাড়ি। কিন্তু খাওয়া আর আড্ডার জায়গা পাহাড়ি বাঁশের। কাছেই নজরমিনার। উঠলেই দৃষ্টিনন্দন লাগে ইলম!

এ এক অন্য ভূস্বর্গ! ঘন সবুজ অরণ্য। চড়াই-উতরাই পথ। শীতের শিহরন। স্থানীয়দের মুখে অমলিন হাসি। সৌন্দর্যের খনিতে হাঁটতে হাঁটতে বুঁদ হয়ে গেছি। বেলাশেষের রোদ্দুরে স্বপ্ন ভিড় করে! রূপকথার দেশে এসে মনে হয় যেন স্বপ্নজড়িমায় আছি। সামনে চা-বাগানের উতলা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নির্ঝর সবুজ। কানে আসে যেন সবুজাভ ঝরনার উচ্ছ্বাস! না তো আশপাশে কোনও পাহাড়িয়া ঝরনার উপস্থিতি নেই। তবে কী! পাহাড়-ছোঁয়া বাতাস চা-বাগানের সবুজ ছুঁয়ে শরীর-মন আবিষ্ট করে! ভয়ংকর ওই সৌন্দর্যের হাতছানি উপেক্ষা করা যায় না কন্যম আর ইলমের ছিপছিপে রোমাঞ্চকর পাহাড়ি পথে!

বাগডোগরা নেমে ঘণ্টা তিনেকে কন্যম। চোখের সামনে শুধুই হিমালয়! হিমালয়ে এত সবুজ কোথাও আছে? নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। উত্তরও দিল মন। যেখানেই থাকুক, এখন এটাই উপভোগ করো। বাগডোগরা থেকে কন্যম পৌঁছতেই মনে পড়ে গেল হযবরল-এর বিড়ালের কথা। যাইহোক, ঘন সবুজ চা-বাগানের মাঝে পাইনের অরণ্য। সামনে সারিবাঁধা উতল পাহাড়। ধাপে ধাপে আরও কত কত পাহাড়! দুই পাহাড়ের মাঝে অতল খাদ। অনন্ত পাহাড় আর নিবিড় অরণ্য বুক চিরে বয়ে চলেছে ঝরনার শব্দে পাহাড়িয়া বাতাস! জমে থাকা সব ক্লান্তি ধুয়েমুছে সাফ হল পাহাড়ের মায়াবী সৌন্দর্যে! কন্যম আর ইলমের শেষ বেলার মুঠোভরা সোনালি বিকেল এক অপার্থিব ভাললাগার জন্ম দেয়। চা-বাগানের পিছনে লাল আভা মাখানো সূর্য ঝপাস করে ঝাঁপ দিতেই মেঘেরা এসে ভিড় করে পাহাড়ি পথ ভরানোর গোল্লাছুট খেলায়!

এত সৌন্দর্যমাখানো এক শৈলাবাস যে লুকিয়ে আছে প্রতিবেশী দেশ নেপালে, এখানে না-এলে তা অজানাই রয়ে যেত। খোঁজ দিয়েছিল রাজ বসু আর অজয় রায়। কয়েক দিনেই বশ করে ফেলল কন্যম আর ইলম। মেঘমাখা ঝিম ধরানো এক দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গেলাম চা-বাগানের সবুজে। কখনও পাইনের অরণ্যে। এখানে এলেই মন চাইবে হারিয়েই যেতে।

নেপালে ভারতীয় মোবাইল সিম চলবে না। তবে হোটেলে ওয়াইফাই আছে। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক করা যাবে। বাইরে থেকে ফোন আসবে।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে এনজেপি বা শিলিগুড়ি। এখান থেকে বাস পাওয়া যাবে কাঁকরভিটার। তারপর ওখান থেকে গাড়ি নিতে হবে। কিংবা দমদম বিমানবন্দর থেকে বাগডোগরা। সেখান থেকে কাঁকরভিটা। তারপর গাড়ি নিতে হবে।

সবচেয়ে ভাল যোগাযোগ করুন হেল্প টুরিজমের সঙ্গে। ফোন: 097330 00445/ 097330 00447.

কন্যম: হোটেল ইস্টন ব্লু, নগেন্দ্র, ফোন- 00977 985 1094645.

ইলম: বিজয় রাই, ফোন: 00977 980 7974886.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

PIONEER IN BENGAL COTTON HANDLOOM SAREES

TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA

WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030

Biswambhar Nag Das & Co:

67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

৩। আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে

না, সেদিন গোধূলি গগনে মেঘ ঢাকেনি। মেঘের যাতায়াতও ছিল না। তবে সেদিনের অমন সন্ধ্যা শেষ কবে পেয়েছিলাম তার হিসেব আমার জানা ছিল না। আর অত হিসেবের কী প্রয়োজন! যতটুকু প্রকৃতির কাছে পাচ্ছি ততটুকুই আগে গ্রহণ করি। গজলডোবায় সেদিন তিস্তার ধারে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ আমাকে বা আমাদের সকলকেই কোন এক মায়ারাজ্যে নিয়ে গেছিল!

সুন্দরের সৌন্দর্যখনি গজলডোবা! শান্ত-স্নিগ্ধ বিকেল। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে বিশ্রামে যাচ্ছে, আগামীকাল সকালে দেখা করার অঙ্গীকারে। বিদায়বেলার উদ্ভাসিত লালিমা সারা আকাশ তো বটেই, তিস্তার জলে পড়ে আছে চুম্বন-সহবাসে! তিস্তার চরে ইতিউতি ফুটে আছে কাশ। বিকালের বাতাসে ঢেউ খেলে যায় কাশ বনে! একঝাঁক পাখি পরিযায়ী ডেকে ডেকে উড়ে গিয়ে বসে জলের আবাসে। তিস্তার পাখিরালয়ে পরিযায়ী পাখিরা আসতে শুরু করেছে একটি, দুটি, পাঁচটি, দশটি দলবেঁধে। কতগুলো হাঁস ভাসছিল তিস্তার বুকে। অস্তগামী ভানুর বিদায় আলো স্মিত ভাসে নদীর বুকে, হাঁসের ডানায়, কাশবনে।

তিস্তার কাছে থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিয়ে বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে। যদিও গজলডোবা এই অরণ্যেরই সঙ্গী। স্থানীয় সঙ্গী অশোক তার অটো নিয়ে হাজির। অটোতে অরণ্যে। জঙ্গলের মেঠোপথে যেতে উড়ছে আবিরের মতো মিহি দানা ধুলো। ঝাড়লেই উড়ে যাচ্ছে। তবে ঝাড়ব কেন! অরণ্যে আসব ধুলো মাখব না, এ আবার হয় নাকি। ধুলো মাখলেই তো অরণ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারা যায়! অটো এসে থামলো একটা টিলামতো জায়গায়। পাশে দৃষ্টি পড়তেই সাবধান বাণী। 'সাপ থেকে সাবধান'। জায়গাটি নাকি বিষাক্ত সাপেদের আড্ডা। তবে যখন গেছি তখন সাপেরা শীতঘুমে ব্যস্ত। তাই ভয়টা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখি। টোটোচালক অর্থাৎ সফরসঙ্গী অশোক দেখাল সরস্বতীপুর চা-বাগান। বিশাল চা-বাগানের ওপর সন্ধ্যা নামছে। হালকা কুয়াশার চাদর মেলতে শুরু করেছে প্রকৃতি। বিশাল বিশাল গাছগুলো আলো-আঁধারির মাঝে কেমন যেন ভৌতিক

ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করে! যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-বাগান সমেত চারিপাশের প্রকৃতির রূপমাধুরী অবলোকন করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি অরণ্য-পাখি তারস্বরে সম্বিত ফেরাল। তাহলে এ কী কোনও সাবধান বাণী! জানি না, তবে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেটি হাতি যাতায়াতের পথ। সময়টা আবার হাতি বেরোবার সময়। চা-বাগানের ভিতর থেকে লেপার্ডও বেরোয় এই সময়। না, আর নয়। অরণ্যে সন্ধ্যা নামে কোনও সুযোগ না-দিয়ে ঝুপ করে।

এবার গজলডোবার তিস্তার ধারে বোরোলি মাছ ভাজা খাওয়ার পরিকল্পনা। তিস্তার ধারে বোরোলি মাছ ভাজা বা স্থানীয় নদী থেকে ধরা কুচোচিংড়ির চপ। আহা, লা-জবাব। সঙ্গে এককাপ কালো কফি বা চা। জমে যাবে। জমেও গেছিল। বোরোলি মাছ যাঁরা একবার খেয়েছেন তাঁরা বারবার খাবেন। আমি নিজেও উত্তরবঙ্গ গেলেই বোরোলি-সর্ষেবাটার ঝাল, বোরোলি মাছ ভাজা খাবই। এবারও অন্যথা হয়নি। বোরোলি হল একেবারেই উত্তরবঙ্গের মাছ। ইলিশের মতো বোরোলি হল নদীর রুপোলি শস্য। তিস্তা, বোরোলি, অরণ্য ইত্যাদি নিয়েই গজলডোবা। আকাশছোঁয়া গাছগাছালি। সবুজ প্রান্তর। কামরাঙা জ্যোৎস্নায় গজলডোবার 'ভোরের আলো'য় রাত্রিবাস এক পরম পাওয়া। বর্ষা শেষে মেঘমুক্ত নীল আকাশ দারুণ লাগে গজলডোবার প্রকৃতির সঙ্গে মিলমিশে! জানা যায়, হাতি চলাচলের পথ গজলডোবা। সবমিলিয়ে গজলডোবা অপূর্ব! তীব্র মাদকতার টান রয়েছে এখানে। বিশেষ করে, পূর্ণিমার কাঁসার থালার মতো চাঁদ উঠে এসে আকাশের মাঝে থেকে তার জ্যোৎস্না বিলিয়ে দেয় যখন তিস্তার জলে, সে এক জাদুময় মুহূর্ত তৈরি হয়! রুপো গলা জল তিস্তা বয়ে নিয়ে যায়। মনে হয়, নদীর জলে হাত দিলে আঙুলে আঙুলে জ্যোৎস্না মাখামাখি হয়ে যাবে! সবমিলিয়ে এক অমোঘ টান গজলডোবার!

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদহ বা কলকাতা স্টেশন থেকে এনজেপি। এনজেপি থেকে গজলডোবা খুব কাছেই। কমবেশি ২০ কিমি।

কোথায় থাকবেন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটন দফতরের 'ভোরের আলো' চমৎকার থাকার জায়গা। এছাড়াও থাকবার আরও জায়গা আছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৪। রূপকথার মতো সুন্দর লাঙ্গুরদং

লাঙ্গুরদং না-গেলে এখানকার রূপসৌন্দর্য বোঝা যাবে না। অবর্ণনীয় রূপ-মাধুর্য! বিজনবাড়ি থেকে দশ কিমি পথটি একেবারে রূপকথার মতো। আর লাঙ্গুরদং তো রূপকথার দেশ। এখানকার প্রকৃতি দিবারাত্রির কাব্য। দীর্ঘ কবিতা। লাঙ্গুরদংয়ে থাকার ঠিকানা 'লাঙ্গুরদং ফার্ম স্টে'। পাহাড়ের কোলে পিকচার পোস্টকার্ডের মতো বাড়িটি মনে হয় যেন কোনও শিল্পী তাঁর বিশাল এক ক্যানভাসে এঁকে রেখেছেন। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলে আলো জ্বলে ওঠে। বাড়ির পশ্চাদপটে দার্জিলিং পাহাড় মনে হয় অসংখ্য জোনাকির সমাগম!

এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে। যখন-তখন মেঘ আসে নেমে। আদরের ছোঁয়া দেয় সারা শরীর জুড়ে। সে এক আনন্দের সময়, সুখের সময়। চরম সুখের সময় আসে যখন গাছগাছালির স্পর্শ পাওয়া যায়। কত রং, কত ফুল, কতশত অর্কিড। হালকা চাঁপা ফুলের রঙে একটি অর্কিড ক্রিসমাস ঘণ্টার মতো ঝুলে থাকে। তার রূপ অপূর্ব বললেও কম বলা হয় অনেকটাই। রঙ্গনফুলের মতো থোকা থোকা ঝুলে থাকে নাম না-জানা এক ফুলের গাছে। সেই ফুলের রং অদ্ভুত এক আবেশ ছড়িয়ে দেয়! চমৎকার রং সেই ফুলের! তার রং কী, কেমন? না, বলতে পারলাম না। তার কারণ, এই রং আগে কী দেখেছি! জানি না, সম্ভবত নয়। পাহাড়ি ফুল আর অর্কিডের রাজ্যে এসে মূক হয়ে যেতে হয়। কারণ, মনের ভাব, মনের আনন্দ প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনি। যাইহোক, লাঙ্গুরদং ফার্মস্টে পিছনে রেখে এগিয়ে চলি ঝরনার খোঁজে। পাহাড়ি পথ। অরণ্যের মাঝে সেই ঝরনা। আসলে কালী নদী জঙ্গলের ভিতর থেকে বয়ে এসে ঝরে পড়ে ঝরনা হয়ে গেছে। ঝরনার জল আর পাহাড়ের খাঁজ তৈরি করেছে এক প্রাকৃতিক স্নানের জায়গা। স্নান করতে পারেন প্রকৃতির মাঝে। সে এক শিহরিত অনুভূতি জোগায় সারা শরীরে! ইচ্ছে করলে সাঁতারও দেওয়া যায় ছোট্ট করে।

একটা কথা বলে রাখি, এখানে যা খাবেন সবই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফার্মস্টের জমির। শাকসবজি থেকে শুরু করে মাছ, মুরগি-- সবই। অবাক হওয়ার কিছু ফার্মস্টের নিজস্ব পুকুরে মাছের চাষ হয়। সেই পুকুরের মাছই মধ্যাহ্নভোজে পাতে পড়ে। অনন্য স্বাদ মাছের। বাঙালি মাছ-ভাত পেলে আর কিছুই চাই না। তবে রাত্রে মুরগিই ভাল। সেটিও ফার্মের। এমনকী ধূমায়িত যে-চা কাপে করে দিয়ে যাবে হোমস্টের ঘরে সেই চা-ও নিজেদের জমির। অপূর্ব স্বাদ সেই চায়ের।

দু'তিন দিনের জন্য ঘুরতে এসে বেশ লাগে। তেমন মনে হলে, ঘুরে আসতে পারেন দার্জিলিং। বাঙালির একান্ত আপন এই পাহাড়ের রানি। রাত্রিবেলা তো দেখাই যাবে দার্জিলিং পাহাড়ে টিপছাপ আলো। মনে হবে, অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে রাতের গভীরে। তবে অরণ্যের পথে হাঁটতে হাঁটতে কোনও জীবজন্তুর দেখা পাবেন কিনা জানি না। তবে বহু পাহাড়ি পাখির দেখা পাবেন, ডাক শুনবেন। আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে দর্শন পাবেন কাঞ্চনজঙ্ঘার। ভোর পাঁচটায় উঠে সূর্যোদয় দেখুন ভিউ পয়েন্টে গিয়ে। আর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা তার অবগুণ্ঠন খুলে দেখায় তার রূপমাধুরীর রূপমহল! তারপর গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়ুন। পাহাড়ি গ্রাম দেখতে ভাল লাগবে।

কীভাবে যাবেন: এনজেপি থেকে বিজনবাড়ি হয়ে লাঙ্গুরদং কমবেশি ১০০ কিমি। ফার্মস্টের বুদ্ধিমানকে বললে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। পড়বে ৫০০০-৬০০০ টাকা। শেয়ার গাড়িতে মাথাপিছু ৫০০ টাকা।

থাকবেন কোথায়: লাঙ্গুরদং ফার্মস্টে ১৩০০-১৫০০ টাকা। মাথাপিছু প্রতিদিন, থাকা-খাওয়া সমেত। আর যাঁরা পাহাড়ে এসে অন্যরকম চান তাঁরা টেন্ট-এ থাকতে পারেন। মাথাপিছু প্রতিদিন, থাকা-খাওয়া সমেত ১০০০ টাকা। যোগাযোগ: বুদ্ধিমান রাই, লাঙ্গুরদং ফার্ম স্টে, মোবাইল: 08967970652.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৫। লজের পাশেই জঙ্গলে বাইসনের চোখ জ্বলে

মাদারিহাট টুরিস্ট লজটি খুব সুন্দর। একবারে হলং নদীর ওপর। ব্রিজটি ভেঙে গেছে গত বর্ষায় তাই একশো-দেড়শো মিটার আগে নেমে হন্টন। কাঠের পাটাতন ফেলে অস্থায়ী সেতু। সেই কাঠের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে হলং নদীর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য চাক্ষুষ করা উপরি পাওনা। অরণ্যের বিশাল বিশাল গাছগাছালি ডালপালা বিস্তার করে নদীজল ছুঁয়েছে। দূরে ছোট্ট একটি ঘাট নেমে গেছে। পাশে একটুকরো সবুজ মাঠ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে দূর আকাশের ভালে।

কেউ একজন বললেন, এখন বন্যপ্রাণীদের বেরোবার সময়। কয়েকজন বনকর্মী চা খাচ্ছিলেন মাসির ঠেকে। একেবারে হলং নদীর গায়েই সেই ঠেক। একজন বললেন, "আজকে যাঁরা দুপুরের সাফারিতে গেছেন তাঁরা খুব ভাগ্যবান। বাইসন, বুনা শুয়োর, হাতি, হরিণ-- সবই দেখা গেছে।"

আমি বললাম, "সন্ধের মুখেই তো বন্যজন্তুর দেখা মেলে।" সেই বনকর্মীটি বললেন, "সে তো আমরা জানি। ওরা কখন বেরুবে, সে তো ওদের মর্জি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে হাতি আসতে পারে?"

বনকর্মীটি বললেন, "আসতেই পারে। ওরা কোথায় যাবে, কখন যাবে, সব ওদের ইচ্ছে।"

তবে ওই সন্ধেবেলা দুটি বাইসন লজ-লাগোয়া জঙ্গলের ধারে এসছিল। জ্বলজ্বল করছিল দুজোড়া চোখ। তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল কুকুরগুলো। স্পট ফেলতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরে গেল অরণ্যের অন্দরে। পরদিন দুটো বুনোশুয়োর আর বাইসন এসেছিল লজের কাছে। আবার স্পট ফেলতেই পালালো সব। লজ আর অরণ্যের মাঝে তারের বেড়া আছে। যাতে কোনও জীবজন্তু ঢুকতে না-পারে লজে।

জলদাপাড়ার সবেচেয়ে বড় আকর্ষণ এক শৃঙ্গ গন্ডার। একসময় নাকি হলং লজের হাতায় এসে গন্ডার ঘুমোতো দিনদুপুরে!

গন্ডার ঘোরাঘুরি করে প্রধানত ঘাসজমিতে। জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তালিকা বেশ দীর্ঘ। গন্ডার ছাড়াও হাতি, হরিণ, বুনো শুয়োর, লেপার্ড, শম্বর। জলদাপাড়া জঙ্গল সাফারি হয় জিপ আর হাতির পিঠে। সকাল, দুপুর আর পড়ন্ত বিকেলে। সাফারিতে গেলেই যে বন্যপ্রাণী

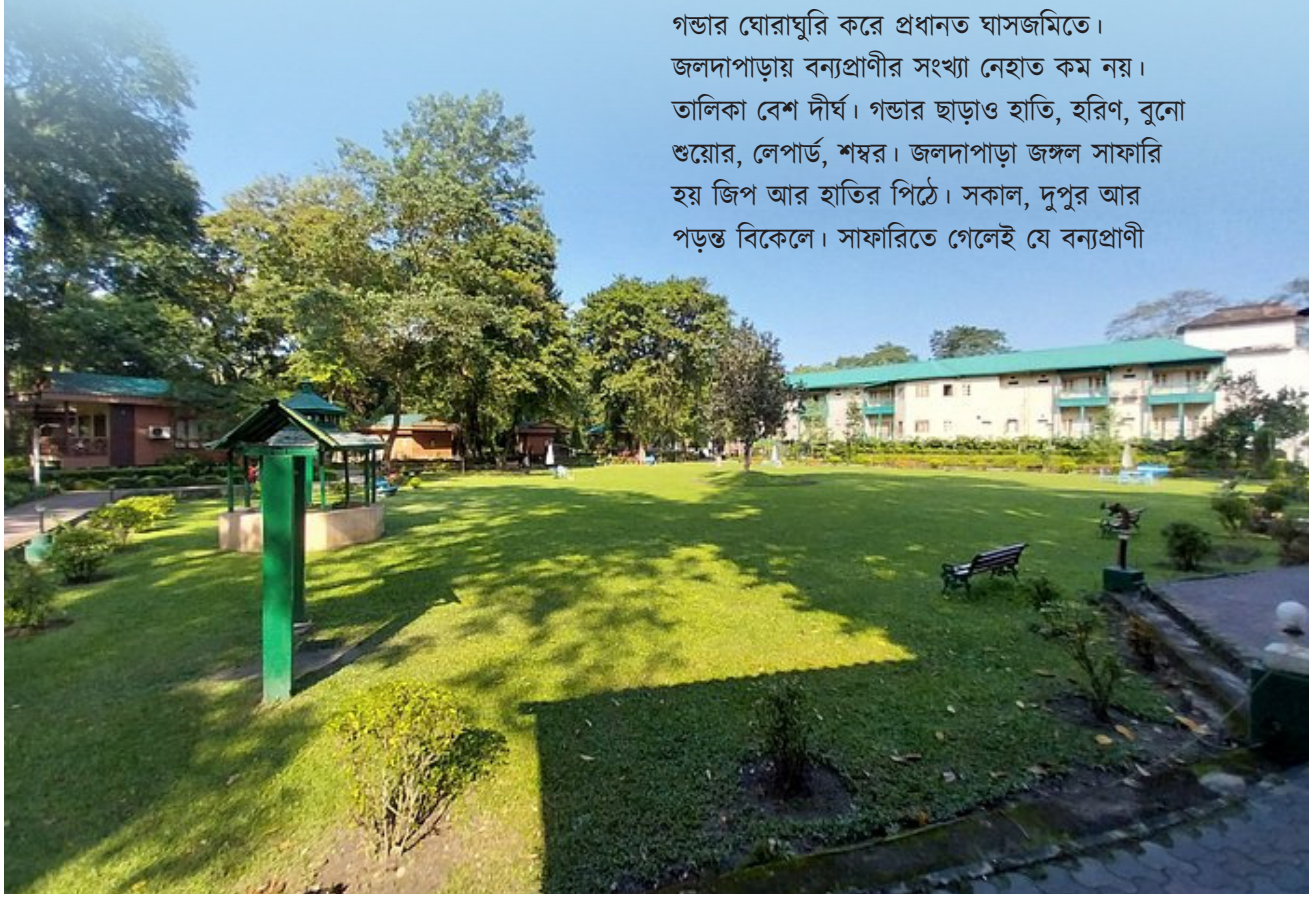

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

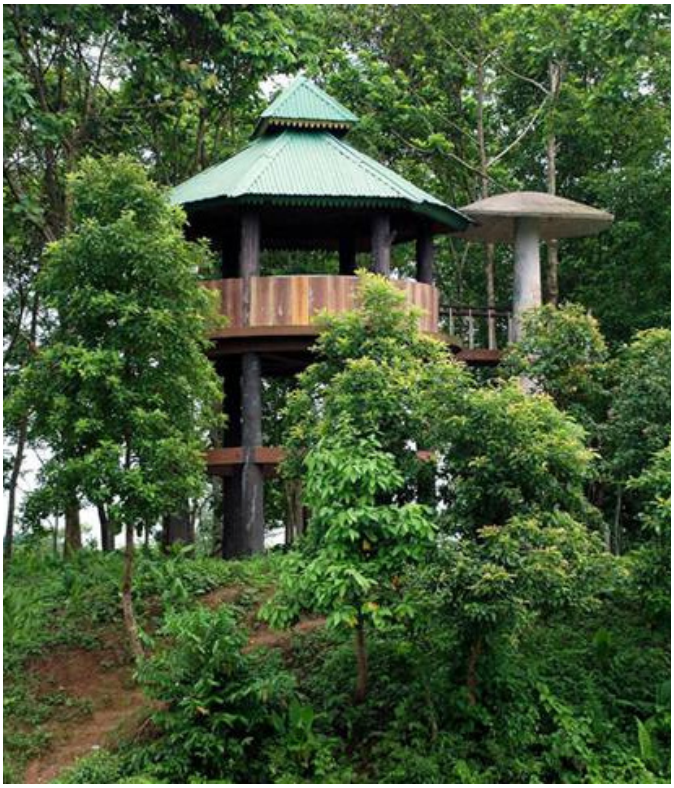

দেখবেন এমনটা নয়। ওদের খেয়ালখুশির ওপর সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ নির্ভর করে। যে কথা আগেই বলেছেন এক বনকর্মী যিনি অরণ্যের গাইড হিসেবে কাজ করছেন বহু বছর।

আর আছে পাখি। নানারকম পাখি। মাছরাঙা, ঘুঘু, বনটিয়া, পানকৌড়ি তো দেখেইছি। আছে সারসের মতো লম্বা ঠোঁটওয়ালা বক, ময়ূর, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি ইত্যাদি। জলদাপাড়া বেশ জনপ্রিয়। বহু মানুষ যান সেখানে। অথচ একটা বেশ নীরবতা, নিস্তব্ধতা উপভোগ করা যায় এখানে। আসলে এখানে সাধারণ পর্যটক ছাড়াও আসেন প্রকৃতিপ্রেমী আর বন্যপ্রাণীপ্রেমিকেরাও।

কীভাবে যাবেন: এনজেপি থেকে মাদারিহাট যেতে লাগবে কমবেশি তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টা।

কোথায় থাকবেন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরে খোঁজ নিন। ইউথ হোস্টেলটিও চমৎকার।

৬। পাহাড়, ফুল আর প্রজাপতি

সারাবছর অফিস করে ক্লান্ত বা ব্যবসা। ক'দিন বেশ নিরিবিলি, নির্জনতায় কাটানোর জন্য কোনও 'অফবিট' জায়গা খুঁজছেন? তাহলে যেতে পারেন বুনকুলুং। নামটা আগে কোনওদিন শোনেননি, তাই তো। শুনবেন কী করে! অনেকের কাছেই অজানা। অথচ এনজেপি বা শিলিগুড়ির সবচেয়ে কাছে একটি অফবিট জায়গা। তাহলে ওই কথাই রইল, এবার বুনকুলুং।

অনেকেই এই শোনেননি বুনকুলুঙের কথা। তাই যাওয়ারও প্রশ্ন নেই। তবে একটা আগেই বলে রাখি বেশিরভাগ মানুষই উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে যান কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে। এখান থেকে সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার আশা করলে হতাশ হতে হবে। তার কারণ, চারিদিক পাহাড়ের বেষ্টনীর মাঝে এক বিশাল উপত্যকা। সেই উপত্যকায় হল বুনকুলুং। এর সৌন্দর্য একেবারে অন্যরকম। পাহাড়ি পথ যেমন হয়, তেমনই রাস্তা। এবড়োখেবড়ো, উঁচুনিচু। জার্নি শেষে ব্যাজার মুখে হাসি ফুটবে। সমস্ত ক্লান্তি, বিরক্তি মুহূর্তে উধাও হবে। মনে হবে স্বর্গের রূপ-মাধুর্যময় কোনও স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন। ছোট্ট মুর্মাখোলা নদী আর কিছু দূরেই বালাসন নদী বয়ে চলেছে নির্বিকার, ক্লান্তিহীন। নদী বোধহয় ক্লান্তিতে ভোগে না। আর পাহাড়ি নদী তো কখনওই নয়। নদীর নিজস্ব এক দর্শন আছে। তার কাছে আগত অতিথিদের অনন্ত আনন্দ দান করা। একঘেয়ে শহুরে জীবনে যখন জেরবার, তখন বুনকুলুংয়ের প্রকৃতি একঝলক টাটকা বাতাস এনে দেবে জীবনে। বেঁচে থাকার অক্সিজেন দেবে। চোখের আরাম এখানকার দিগন্তজোড়া সবুজের সমারোহ। সবচেয়ে ভাল লাগে দিগন্তবিস্তৃত চা-বাগান! ওপর থেকে নীচের চা-বাগান অদ্ভুত এক নেশা লাগিয়ে দেয় সবুজে ডুবে থাকার। এ-স্বাদ আপনজনেদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বড় ভাল লাগে। বুনকুলুঙের রূপ-লাবণ্যের সঙ্গে শীতে যোগ করে কমলালেবুর বাগিচার সুগন্ধ! আর সবুজের সঙ্গে মিলেমিশে কমলালেবু রং অন্যমাত্রা এনে দেয়। প্রতিটি পাহাড়ি রাতের মতো এখানকার রাত্রিও ভীষণই মোহময়ী! বুনকুলুঙের নিস্তব্ধতার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আবহে অন্য আর এক সুর অন্য পাহাড় থেকে। অন্য এক রোমাঞ্চ শিহরিত করে। ওই রাত্রিবেলা যদি প্রিয়জন পাশে থাকে তাহলে অন্য রোম্যান্স জন্ম নেবে নতুন করে। না। শুধু হাতে হাত রেখে বসে থাকুন। সাক্ষী থাকুক আকাশের তারা-নক্ষত্রেরা! এমন রোম্যান্টিক রাত আসবে না বারবার। দেখবেন রাত কেটে পুব দিগন্তে আলোর লালিমা। ঘুম ভাঙানিয়া পাখিরা নীড় ছেড়ে বেরিয়ে বুনকুলুঙে আসা অতিথিদের বিছানা ছাড়ার কথা বলছে। কত পাখি। আর আছে প্রজাপতি। এত রংবেরঙের নকশাকরা প্রজাপতি আর কোথাও দেখেছি বলে এই মুহূর্তে স্মরণে আসছে না। চা-বিস্কুট খেয়ে গ্রাম দেখতে বেরোন। পাহাড়ি গ্রামের বাড়িগুলো খুব সুন্দর। কাছেই চা-বাগান। প্রায় সর্বত্রই ফুল ফুটে আছে। নানারঙের ফুল। আর পাহাড়ি ফুলের রং তো ভীষণ সুন্দর আর মনকাড়া। কাছেই বালাসন নদী। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান। ভাল লাগবে। জুড়িয়ে যাবে হৃদয়! আছে ছোট্ট একটি সেতু। তার ওপর দাঁড়ালে চোখে পড়বে ছোট্ট পাহাড়ি খোলা নূপুরের শব্দ তুলে নিরন্তর বয়ে চলেছে!

সবমিলিয়ে শহুরে কোলাহল থেকে দু'দণ্ড বিশ্রাম দিতে পারে নাটোরের বনলতা সেন-এর মতো বুনকুলুংও। নিরিবিলিতে ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা। বুনকুলুঙে যে-কোনও ঋতুতে আসা যেতে পারে। শীতে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পড়লেও বুনকুলুং ধীর স্থির শান্ত। চারদিকে পাহাড়-ঘেরার কারণে ঠান্ডা তার তীব্রতা নিয়ে পৌঁছতে পারে না। বেশ আরামদায়ক ঠান্ডা এখানে। সবমিলিয়ে এক স্বর্গীয়-আনন্দ খেলা করে মনে, হৃদয় জুড়ে!

কীভাবে যাবেন: এনজেপি থেকে খুব দূরে নয়। কমবেশি ঘণ্টাদেড়েকের পথ। এনজেপির সবচেয়ে কাছের অফবিট ডেস্টিনেশন বুনকুলুং। গাড়ি ২৫০০-৩০০০ টাকা পড়বে।

কোথায় থাকবেন: বুনকুলুং রিট্রিট ইকো হাট।

ভাড়া: সময় বিশেষে পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবুও মোটামুটি ১৬০০-২২০০ টাকা। মাথাপিছু প্রতিদিন থাকা-খাওয়া নিয়ে। যোগাযোগ: 8967392633. এছাড়াও আরও অনেক হোমস্টে আছে।

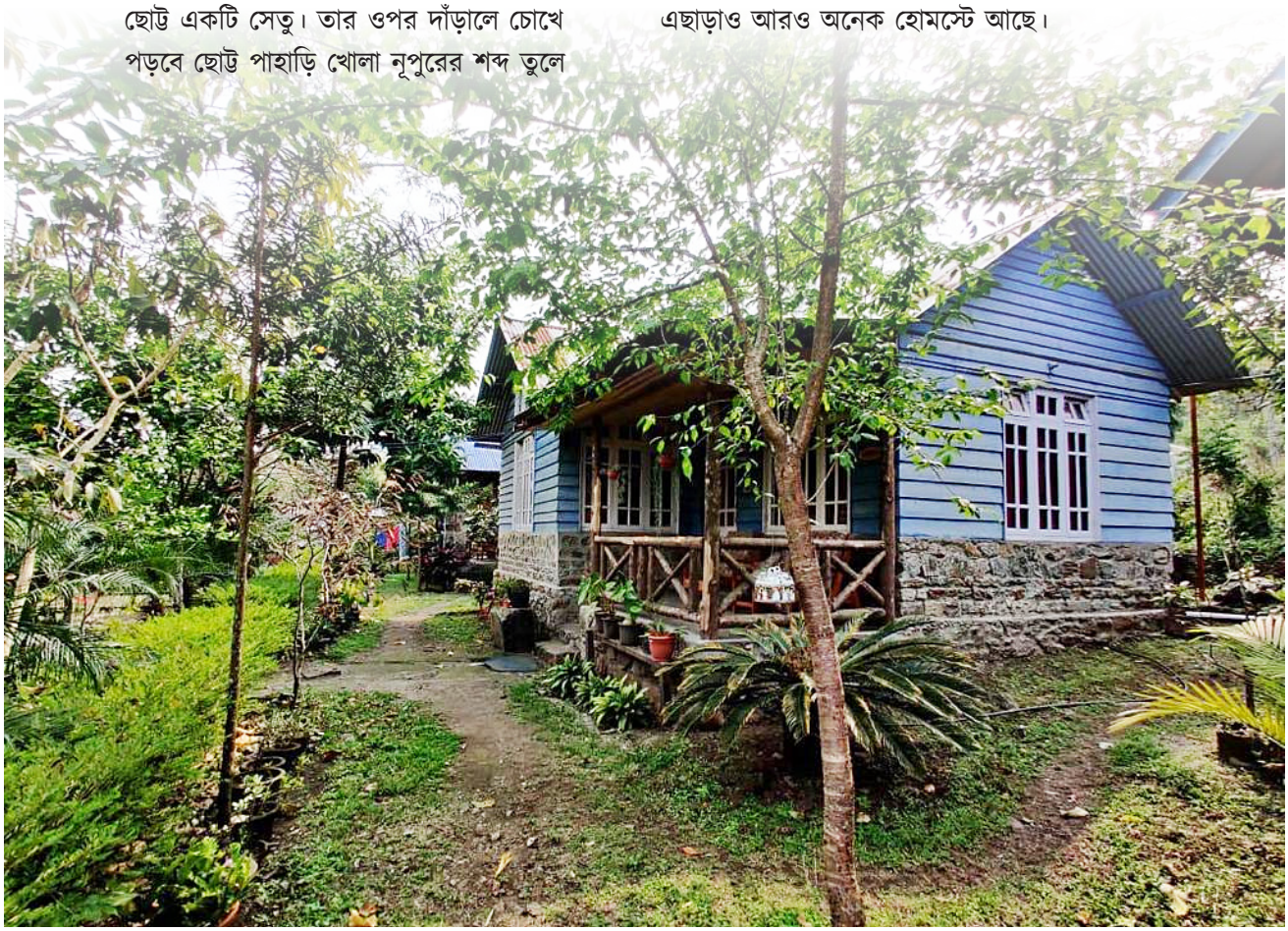

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৭। নামে চটক, সৌন্দর্যে লাবণ্যময় আভিজাত্য

আচ্ছা এত পাহাড় থাকতে দার্জিলিং আর মুসৌরিকে 'পাহাড়ের রানি' কেন বলা হয়! সকলের মতো আমিও বিস্মিত হতাম! পরে মনে হল, এই দুই পাহাড়ি শহরের আভিজাত্য একবারে অন্যরকম-- সুয়োরানির মতো। বাঙালি বরাবরই দার্জিলিঙের প্রেমে মশগুল। এখনও বহু ভ্রমণপ্রিয় আছেন যাঁরা নিয়ম করে দার্জিলিং যান ফি-বছর। এঁদের মধ্যেই অনেকেই আবার দার্জিলিঙের কাছেপিঠে থেকে মজাটা উপভোগ করতে চাইছেন পাহাড়ের রানির। কেন? এই 'কেন'র উত্তর জানা নেই। তবে একেবারে যে দার্জিলিঙের মায়া ত্যাগ করেছেন তা কিন্তু নয়। মায়াবী পাহাড়ি শহরের মায়া কাটানো খুব মুশকিল! তাহলে? তাহলে আর কী, ঘণ্টা দেড়েকের পথ উজিয়ে সারাদিন দার্জিলিং কাটিয়ে চলে আসেন তাঁর জায়গায়। জায়গাটির নাম কি? কেনইবা খুঁজে নিয়েছেন তাঁরা দার্জিলিঙের বিকল্প!

কমবেশি ২১ কিমি দূরত্ব চটকপুর আর দার্জিলিঙের। চমৎকার জায়গা। নামে চটক থাকলেও সৌন্দর্যে বিন্দুমাত্র চটক নেই বরং আছে আভিজাত্যপূর্ণ সৌন্দর্য। যে-সৌন্দর্যে আত্মম্ভরিতা নেই, আছে হৃদয় উজাড় করা রূপমাধুরী! পুরনো দার্জিলিঙের মধ্যে যা খুঁজে পেতেন সেকালের বাঙালি ভ্রমণপিয়াসী মানুষজন! পাহাড়ি রাস্তার দুপাশে পাইন আর বিশাল গাছগাছালির আলোছায়াময় পথ বড়ই মোহময়ী! যার টানে বারবার আসতে হয় চটকপুর।

চেনা ছকের বাইরে অপূর্ব এক জায়গা চটকপুর। রূপের চটক নয়, রয়েছে রূপ-মাধুর্যের মায়াবী সৌন্দর্য! ভাল না বেসে পারবেন না! দার্জিলিং থেকে মাত্র ২১-২২ কিমি। সিঞ্চল বা সেঞ্চল ওয়াইল্ড লাইফ স্যানচুয়ারির ভিতর ছোট্ট একটি ইকো ভিলেজ চটকপুর। এখানে সবকিছুই পরিবেশবান্ধব। তাই প্ল্যাস্টিক ব্যবহার করবেন না। নিজদের জঞ্জাল নিজেরা পরিষ্কার করবেন। প্রায়

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আট হাজার ফুট উঁচুতে ছোট্ট মায়াবী গ্রামটিতে বসে উপভোগ করতে পারবেন কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপসৌন্দর্য আর অরণ্য পাহাড়ের মাদকতা! মাতাল করে দেয় চটকপুরের প্রকৃতি! সত্তর দশকের মাঝামাঝি সিঞ্চল বা সেঞ্চল অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পাইন, ওক, বার্চ, জুনিপার আর বিভিন্ন রকমের ফার্ন দেখা দেখা যায় অরণ্যে। আর অরণ্যে লেপার্ড, ভালুক, বিভিন্ন জাতের বাঁদর ইত্যাদি দেখা যায়। আর আছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।

এছাড়াও এই গ্রামে আছে একটি নজরমিনার বা ওয়াচটাওয়ার। যেখানে আপনাকে নিয়ে যাবেন স্থানীয় গাইড। এখান থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত এককথায় অপূর্ব, অবর্ণনীয়! গাউড নিয়ে যাবেন কালা পোখরি। অরণ্যের ভিতর একটি লেক।

এই গ্রামে লোকজন খুব বেশি নেই। তাই খুবই নিরিবিলি নির্জন। কানে আসে বাতাসে পাতা খসার শব্দ! পাহাড় আর অরণ্য ঘেরা ছোট্ট এই গ্রামের মনমাতানো প্রাকৃতিক পরিবেশ নিমেষেই হৃদয় মন দুইই হরন করে নেয় চটকপুরে আগত অতিথিদের! চটকপুর একবার এলে তাঁরা কেউই কখনও ভুলতে পারবেন না। চটকপুরের রূপমাধুরী এমনই রূপকথার পাহাড়ি গ্রাম!

চটকপুরের প্রধান আকর্ষণ পর্বতমালার অসাধারণ দৃশ্য। গ্রামটির চারপাশে শুধুই সবুজ আর সবুজ। আর তারই ফাঁকে উঁকি দেয় বরফাচ্ছাদিত দিগন্ত জোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় আকাশ পরিস্কার থাকলে। গভীর অরণ্য নৈঃশব্দ্যময়। নৈঃশব্দ্য ভাঙে পাখির ডাকে, পাখির গানে। পাহাড়ের ধাপে ধাপে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা সুন্দর কাঠের বাড়িগুলো লাগে ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো! আর তারই মাঝে বিশাল বিশাল গাছগুলোর নীচে পায়ে চলা পথ অপেক্ষায় আছে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পর্যটকদের।

সোনাদা থেকে চটকপুরের দূরত্ব ৭-৮ কিমি। যাঁরা ঘুরতে বেরিয়ে ট্রেকিংয়ের মজা পেতে চান তাঁরা অবশ্যই গাড়িতে নয়, হেঁটে আসুন। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়বে। এ এক বিশাল পাওনা। আসবার ভাগ্য সহযোগিতা করলে লেপার্ড বা ভালুক চোখে পড়বে। অন্যান্য বন্যপ্রাণীও নজরে আসতে পারে। তবে প্রকৃতি আপনাকে বা আপনাদের বিমুখ করবে না এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, একজন গাইড নেবেন। নইলে রাস্তা গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সবচেয়ে ভাল হবে, একবার হেঁটে একবার গাড়িতে আসুন এবং যান চটকপুর।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদা বা হাওড়া স্টেশন থেকে এনজেপি। এনজেপি থেকে চটকপুর কমবেশি ৬৪ কিমি। ঘণ্টা তিন সাড়ে তিন লাগে। জ্যাম থাকলে চার ঘণ্টা। অনেকে সোনাদা হিয়ে চটকপুর আসেন, অনেকে তিন মাইল হয়ে। যেদিক দিয়েই আসুন মাথাপিছু ১২০ টাকা আর গাড়ির জন্য ৪০০ টাকা লাগে চটকপুর প্রবেশের জন্য।

কোথায় থাকবেন: কুলুং হোমস্টে, প্রতিদিন মাথাপিছু খাওয়াদাওয়া (প্রাতঃরাশ থেকে রাতের খাওয়া) ১৩০০-১৫০০টাকা। যোগাযোগ: বিনোদ রাই, মোবাইল- 07602299041/09609740489 (Whatsapp no). বিনোদকে আগে থেকে বললে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে এনজেপি স্টেশনে। ভাড়া- ৩৫০০টাকা। স্থানীয় গাইডের পারিশ্রমিক ৫০০টাকা। এছাড়াও একাধিক হোমস্টে আছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৮। কমলালেবুর দেশে

শীতের ছুটি যদি কাটে কমলালেবুর দেশে, তাহলে কেমন হয়? মন্দ হবে না! সেইসঙ্গে কমলালেবুর রাজ্যে আবার খুঁজে পেলেন একটুকরো ইয়োরোপ! তাহলে? তাহলে আর কী সোনায় সোহাগা। আবার কেউ কেউ বলেন কাশ্মীর, দার্জিলিঙের কাশ্মীর! ইয়োরোপ হোক বা কাশ্মীর, জায়গাটি নিশ্চয়ই সুন্দর হবে। নইলে এমন তুলনা কেন! তাহলে আর দেরি কেন, দিনক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাক।

কিন্তু যাবটা কোথায়! জায়গার নাম? জায়গাটি হল উত্তরবঙ্গের সিটং। যেখানে শীতের হিমেল বাতাসে কমলালেবুর গন্ধ আর প্রকৃতির সুবাস! দুনিয়ায় কোনও কোলাহল স্পর্শ করে না এখানে। স্পর্শ করে না মালিন্য। এ এক অপূর্ব দুনিয়া! তাই এবার শীতের অল্পদিনের ছুটি কাটুক দার্জিলিঙের কাছে কমলালেবুর বাগানে। সিটংয়ের পরিচিতি কমলালেবুর বাগান হিসেবেই। কেবলমাত্র কমলালেবু বাগান নয়, চারিদিকে চা-বাগান। মনে হবে কেউ সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছে পুরো এলাকা জুড়ে। প্রকৃতি নামে শিল্পীটি তাঁর রং-তুলিতে এঁকে রেখেছেন সিটং নামে নিখুঁত এই জায়গাটি। পাখির রাজ্যে কমলালেবুর বাগান। অনেকেই বলেন, সিটংয়ের কিছুটা কাশ্মীর, কিছুটা ইয়োরোপ!

সিটং মানেই কমলালেবুর গ্রাম আর কমলালেবুর কোয়ার মতো সুন্দর এবং মিষ্টি! সিটং থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিবিজড়িত মংপু মাত্র আট কিমি। মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে মাত্র চার কিমি। পাহাড়ি নদী রিয়াং বয়ে চলেছে আপন মনে নিজের মতো কমলালেবু গ্রামের একপাশ দিয়ে। হোমস্টে থেকে মাত্র দু'কিমি। যোগীঘাটে রিয়াং নদীর ওপর সেতুটি পেরিয়ে মংপু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত সেই মংপু। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই সিঙ্কোনা চাষের জন্য মংপুর নাম প্রায় সকলেরই জানা। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান ভাল লাগবে। যাঁরা ট্রেক করতে ভালবাসেন তাঁদের ছোট্ট চমৎকার একটি হাঁটাপথ বা ট্রেকিং রুট।

কাছেই আরও একটি চমৎকার জায়গা অহলদাড়া। হাঁটাপথে মাত্র তিন কিমি। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা অপূর্ব লাগে! ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উন্মুক্ত প্রকৃতি দেখা সারা জীবনের এক অভিজ্ঞতা। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে হলে এখানে আসতেই হবে। আর হোমস্টে থেকে উপত্যকার দৃশ্য চোখে পড়ে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা আত্মার আরাম! অরণ্যের ভিতর দিয়ে পাহাড়ি পথ চলে গেছে নামথিং পোখরি। বলা হয়, এই লেকটি নাকি হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার-এর ঘরবাড়ি। জঙ্গলটি বেশ গা-ছমছমে! পাখি আর প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় চারপাশে। আরণ্যক নির্জনতায় হিমালয়ের পাখির ডাক আর রং-ঝরানো ডানা মেলে উড়ে যাওয়া জাদু-মুহূর্ত তৈরি করবে একঝলকে! এই আনন্দ উপভোগ করতে হলে যেতে হবে সিটং।

দূর থেকে দেখা যায় লেপচা ওয়াটার ফলস। নিরিবিলি শান্ত পাহাড়ি গ্রাম সিটংয়ে নিভৃতে একা একা কাটাতে বেশ ভাল লাগে। উপভোগ করা যায় প্রকৃতির রূপ-মাধুর্য! সিটং যেন পটে আঁকা ছবি! প্রকৃতির মোহিনী মায়া হাতছানি দেয়! রূপসৌন্দর্যের বার্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রূপকথার সিটং। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে পাহাড়ে, অরণ্যে। কুলায় ফেরে ঝাঁকবাঁধা পাখি। ডানা মেলে পাখির নীড়ে ফেরার ব্যস্ততা দেখতে দেখতে হারিয়ে যেতে হয় আকাশ পথে। সিটং শুধু কমলালেবুর গ্রাম নয়, পাখিরও রাজ্য। দ্রুত পট পরিবর্তন হয় সিটং জুড়ে। নেমে আসে চাঁদ তার মায়াবী জ্যোৎস্না মেখে। ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উপত্যকা জুড়ে। সে দৃশ্য মানসপটে তোলা থাকবে সারাজীবন!

আশপাশেও ঘোরাঘুরির জায়গা প্রচুর। বলতে ভুলে গেছি, ঘুরতে গিয়ে ট্রেকিং যাঁদের পছন্দ, তাঁরা ভায়া মংপু হয়ে লাবদা যেতে পারেন। কাছাকাছি একফালি স্বর্গ। স্বপ্নের মতো জায়গা! লাবদা বস্তি। মংপুর একেবারে কাছে এই জায়গা। একেবারে গ্রামীণ পরিবেশ। পাহাড়ি গ্রাম যেমন হয়, তেমনই। ইচ্ছে করলে এখানকার হোমস্টে, ফার্ম স্টে-তে থাকা যায়। সাজানোগোছানো ছবির মতো গ্রাম। খুব পরিচিত নয়, তাই পর্যটকে আনাগোনা কম এখানে। চমৎকার জায়গা। তবে ট্রেক করার আগে বন দফতরের অনুমতি নিতে হবে। না, এর জন্য কাঠখড় পোড়াতে হবে না।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদা থেকে এনজেপি। তারপর গাড়িতে। সিটং যাওয়ার গোটা তিনেক পথ আছে। তবে যে-পথেই যাবেন সেই পথেই মন ভরবে প্রকৃতির রূপমাধুরীতে! হোমস্টেতে আগাম বললে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। ভাড়া- ৩০০০-৩৫০০ হাজার টাকা। আর আশপাশে ঘোরাঘুরির জন্য লাগবে ৩২০০ টাকা। নইলে যোগাযোগ করুন- Travellers companion, Ritam Sengupta, Mobile - 9832434027, 8250760028.

কোথায় থাকবেন: হামারো হোমস্টে। ভাড়া- প্রতিদিন মাথাপিছু থাকা-খাওয়া (প্রাতঃরাশ থেকে রাতের খাওয়া) ১৪০০টাকা। মোবাইল- 097330 71716.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৯। নির্জনতার অপর নাম ধাজয়াতার গাঁও নাকি ধাঁয়াটার গাঁও

মিরিক তো একাধিকবার গেছেন কিন্তু ছ'কিমি দূরে ধাজয়াতার (Dhajyatar) গাঁও গেছেন? অনেকেই বলেন ধাঁয়াটার গাঁও। স্থানীয় হোমস্টের মালিক বললেন, dhajyatar গাঁও। হয়তো যাননি। কিংবা গেছেন। মিরিক থেকে ছ'কিমি ওপরে গোপালদাঁড়া চা-বাগানের কাছে এই পাহাড়ি গ্রাম। গোপালদাঁড়াও ভারী সুন্দর এক পাহাড়ি গ্রাম। ছবির মতো সাজানো। মাত্র গোটা পঁচিশ পরিবারের বাস। এখানে হোমস্টে পেলে থাকতে পারেন ভাল লাগবে।

যাঁরা প্রথমদিকে লাভা গেছেন তাঁরা যে-লাভা দেখেছিলেন, উপভোগ করেছিলেন, নির্জনতায় নিজেকে মেলে দিয়েছিলেন, তাঁরা ভীষণই মিল খুঁজে পাবেন ধাজয়াতার গাঁওয়ের সঙ্গে। আমি অন্তত পেয়েছি। লাভাতে যেমন হঠাৎ হঠাৎই মেঘ-কুয়াশা নেমে আসে, চারিদিক কুয়াশা-মাখানো মেঘের সাদা চাদরে মুড়ে দেয়, এখানেও তেমনই। চারিদিক নিস্তব্ধতা, নির্জনতা বিরাজ করে। সেইসঙ্গে প্রকৃতি বাতাসে গান শোনায়! বিশাল বিশাল গাছের পাতায় সুরধ্বনি শোনা যায় অস্ফুটে! মাঝেমধ্যে নূপুর ধ্বনি ভেসে আসে পাহাড়ি বাতাসে! সে যে মানসিক সুখ-আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ তা অবর্ণনীয়! অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্যে ঘেরা ছবির মতো গ্রাম। মনে হবে প্রকৃতি যেন অদৃশ্য এক দেয়ালে কোনও এক শিল্পীর আঁকা ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে রেখেছে! যে-ক্যালেন্ডারে দিনক্ষণ বদলায় না, বদলায় না মাস, বছর। তা বলে কী দিনের বদল হয়। একদিন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অন্যদিনের চেয়ে ভিন্ন। ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে প্রকৃতি। ভ্রমণপিপাসু মানুষ সেই রূপে মোহিত হয়ে নিজেকে সমর্পণ করেন প্রকৃতির কাছে। তাই প্রকৃতিপ্রেমীরাই ভালবাসেন এই
না হলে পর্যটকরা খুব একটা ভিড় জমান না সেসব জায়গায়। সেরকমই এক জায়গা ধাঁয়াটার গাঁও। দার্জিলিং কিংবা কালিম্পংয়ের মতো ভিড় নেই এখানে। চায়ের বাগান, ছোট টিলা ঘেরা এক ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। ধুপি আর পাইনে ঘেরা ধাজয়াতার গাঁও ক্রমশ পরিচিতি পাচ্ছে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে। এই পাহাড়ি গ্রামের সৌন্দর্যের স্বাদ উপভোগ করতে করতে মনের অজান্তে কখন যে আপনি হারিয়ে যাবেন এই এক অজানা গাঁওয়ে বুঝতেই পারবেন না! আসলে এমন কোলাহলমুক্ত পরিবেশ এবং প্রকৃতি কবে কোথায় পেয়েছিলেন তা আপনার স্মরণেই আসবে না! বিস্মিত হবেন!
দার্জিলিং থেকে মাত্র ঘণ্টা দুইয়ের পথ ধাজয়াতার গাঁও।
যেসব ভ্রামণিক প্রকৃতির নির্জনতাকে উপলব্ধি বা উপভোগ করতে চান তাঁদের কাছে অফবিট ঠিকানা হতে পারে এই পাহাড়ি ছোট্ট গ্রামটি। এখানেই আছে এক ছোট্ট হোম স্টে--- শমীন্দ্র হোমস্টে। এখানকার খাবার যেমন সুস্বাদু তেমনই এঁদের উষ্ণ আতিথিয়তা। ভোরে আর বিকেলে পড়ুন গ্রামের পাহাড়ি পথে, ভাল লাগবে। তবে বলে রাখি এখান থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা পাবেন না, পাবেন নেপালের পাহাড়গুলোর সমাবেশ। তবে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে হোমস্টের ব্যালকনি থেকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মনভাসির টানে ভেসে যাবেন পাহাড়ের হিমেল বাতাসে। মনেই অদেখা রয়ে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা।
খরচ খুব একটা বেশি নয় শমীন্দ্র হোমস্টে-তে। প্রতিদিন মাথাপিছু থাকা-খাওয়া, প্রাতঃরাশ থেকে রাতের খাবার ১৫০০ টাকা। আগে থেকে বলে রাখলে এনজেপি-তে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন হোমস্টের মালিক। এনজেপি থেকে গাড়িভাড়া লাগবে ৩৫০০ টাকা। যোগাযোগ: শমীন্দ্র হোমস্টে, মোবাইল: 8207216607.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১০। অরণ্যের সৌন্দর্যে নতজানু

প্রকৃতি তার রূপ-মাধুর্যের ঝুলি উজাড় করে দিয়েছে! আকাশছোঁয়া পাহাড় থেকে সবুজ উপত্যকা, নদী, ঝরনা, অরণ্যের অন্দরে বন্যপ্রাণ, রঙিন ডানার পক্ষীকুল ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে সিমলিপাল অভয়ারণ্য। আর আছে, মানে ছিল স্মৃতির খৈরি। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'খৈরী, আমার খৈরী' সবাইয়ের স্মৃতিতে জাগরূক হয়ে আছে। বিশেষ করে যাঁরা খৈরীকে দেখেছেন তাঁদের কাছে খৈরীর স্মৃতি অমলিন। খৈরী ছিল সরোজ রায়চৌধুরীর পোষা বাঘ। মানুষ আর বন্যপ্রাণীর সঙ্গে যে সখ্য, ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে তা খৈরী বুঝিয়ে দিয়েছিল।

যাইহোক, অতীতের রাজপরিবারের মৃগয়া ক্ষেত্র আজ সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত। দেশের অন্যতম বৃহৎ অভয়ারণ্য। এই বিশাল অরণ্যে বহুরকমের গাছগাছালি। অরণ্যের বুক চিরে চলে গেছে ছোট ছোট নদী। আছে বিশাল এক জলপ্রপাত বরেহিপানি। স্থানীয়দের কাছে বরোহিপানি। এর বাংলা অর্থ-- দড়ি আর জল। অর্থাৎ দড়ির পাক খাওয়ার মতো যে-জল ওপর থেকে ঝরে পড়ে। প্রায় দেড় হাজার ফুট ওপর থেকে ঝরে। এর রূপ এককথায় অপূর্ব! অরণ্যের ভিতর ঝরনা বা ওয়াটারফলস সৌন্দর্যের অন্যমাত্রা সৃষ্টি করে, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অনেকটা সময় কেটে যাবে অরণ্যের এই ঝরনাতলায়! আরও একটি অতুলনীয় সুন্দর জলপ্রপাত আছে অরণ্যের মাঝে--- জোরান্ডা। স্থানীয়দের কাছে--ঝোরন্দা। যার অর্থ ঝরে পড়া জল। অপূর্ব দৃশ্য! মনে হবে যেন মেঘের দেশে এসে পড়েছি!

অরণ্যপ্রেমীরা কেন সিমলিপাল অভয়ারণ্যে বারবার আসেন! কেন এত কৌতূহল! মোদ্দা কথা, আমাদের দেশের বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে সিমলিপাল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গভীর অরণ্য, জঙ্গলের মাঝে অপূর্ব তৃণভূমি, নদী-জলপ্রপাত। অরণ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার লেপার্ড, বুনোমোষ, বাইসন, হাতি, ভালুক, হরিণ, চার শিংয়ের অ্যান্টিলোপ, সম্বর, প্যাঙ্গোলিন, শজারু, নানাধরনের বাঁদর,

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

জায়েন্ট কাঠবেড়ালি সব মিলিয়ে প্রায় ৩৬০-৩৭০ ধরনের বন্যপ্রাণী, ৩০০-৩৫০ প্রজাতির পাখি, ৬০-৭০ ধরনের সরিসৃপ, ২০-২৫ রকমের ব্যাং, ১৬০-১৭০ প্রজাতির। কীটপতঙ্গ পাওয়া যায় এই বিশাল অরণ্যে! এখানে রয়েছে আদিবাসী উপজাতি বসতিও। সবমিলিয়ে সিমলিপাল খুবই আকর্ষণীয় অরণ্যপ্রেমী এবং পশুপ্রেমীদের কাছে।

বলে রাখি সিমলিপাল অরণ্যের মাঝ আছে আরও একটি আকর্ষণীয় জায়গা, চাহলা সল্টপিট। জঙ্গলের কোর এরিয়ায় এই সল্টপিট। হাতির দল নুন খেতে আসে। পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পথে হাতির দল মাঝেমধ্যেই দেখা দেয় কখনও কখনও রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ায় বুনো হাতির দল। ওয়াচ-টাওয়ার থেকে দেখা যায় অরণ্যের মাঝে বন্যপ্রাণীদের। সবচেয়ে ভাল প্যাকেজ টুরে যাওয়া। তাহলে কোনও ভাবনাচিন্তা থাকে না। প্যাকেজ টুরের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: JUNGLE KANYA & TOURS TRAVELS. (Pranab Traveller's),. Contact - 9641937200.

এদের প্যাকেজ টুর: দু'রাত তিনদিন ৭৫০০ টাকা। তিনরাত চারদিন ৯৫০০ টাকা। জেনে রাখা ভাল, সাত থেকে আট জনের জন্য এই প্যাকেজ। যাত্রী সংখ্যা কম হলে প্যাকেজের দাম বাড়বে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১১। নামে খ্যাঁদারানি, রূপে উর্বশী

উর্বশীকে আমি দেখিনি, দেখার কথাও নয়। তিনি নাকি স্বর্গের স্বপ্ন সুন্দরী! তবে আমাদের খ্যাঁদারানিও কম যায় না। তার রূপসৌন্দর্য মুগ্ধ করবেই, একথা বলা যেতেই পারে। খ্যাঁদারানি কোনও মহিলা নন, বেলপাহাড়ির এক ঝরনার নাম। উন্মুক্ত খোলা প্রকৃতির মাঝে এক জলপ্রপাত। অরণ্য ভেদ করে নেমেছে। যেখানে থমকে আছে সেখানে তৈরি হয়েছে এক প্রাকৃতিক স্নানের জায়গা। বিশাল বিশাল কালো কুচকুচে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বহু স্নানের আনন্দও নেন। এখানকার প্রকৃতি এতটাই খোলামেলা যে, হাতির দল মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়ে কখনও প্রাতঃভ্রমণে, কখনও বৈকালিক ভ্রমণে। আমরা যেদিন খ্যাঁদারানির কাছে গেছিলাম, সেদিন দেখি কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পিকনিক করছে। তারই মধ্যে হঠাৎই বনকর্মীরা ঘোষণা করতে করতে চলেছেন, "আপনারা এই জায়গা ছেড়ে এখনই চলে যান, একটি হাতির দল বেরিয়েছে।" দেখলাম স্থানীয় এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কোনওরকম হেলদোল নেই। আসলে এইসব শুনে শুনে ওরা অভ্যস্ত। আমরাও বুকে বল পেলাম কিছুটা। হঠাৎ চমকে দিয়ে দুই মোষের মারামারি দেখে চমকে গেলাম। স্থানীয়রা বললেন, "ওই ধারে যাবেন না। সম্ভবত বুনো মোষের লড়াই চলছে।" তবে পশ্চিম মেদিনীপুরে বুনো মোষ আছে বলে আমার জানা নেই।

যাইহোক, বিকেলের অনেকটা সময় কাটলো খ্যাঁদারানির কাছে। জলের ধারে প্রকাণ্ড পাথরের বসে নিজেকে কেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। শাল অরণ্যের মধ্যে খ্যাঁদারানি লেক। ঝরনা থেকে সৃষ্টি। তার এমন নাম কেন, জানা নেই। পড়ন্ত বিকেলে আকাশের মাঝে ডুব দেওয়া সূর্যের লালিমায় খ্যাঁদারানির রূপমাধুরী মন ভরিয়ে দেয়! খ্যাঁদারানির পাশেই পাহাড়ের কোলে সূর্যের টুপ করে ডুব দেয় তখন তার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে মুগ্ধ না-হয়ে উপায় নেই! খ্যাঁদারানির আশপাশে মানুষজনে দেখা তেমন মেলে না। অরণ্যের মাঝে হ্রদ, আর অন্যদিকে ঢেউ খেলানো

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সবুজ ধু ধু মাঠ। বেলপাহাড়ির আনাচকানাচে গভীর অরণ্যানীর অন্দরমহলে কোথাও ঝরনা আবার কোথাওবা জলাশয়, অন্যকোথাও প্রাগৈতিহাসিক গুহা। সেসব গুহা দেখলেই মালুম হবে সেযুগে আদিম মানুষেরা এখানে ছিল। ছিল যে তার নিদর্শন মিলেছে তো এখানে। বছর পঁচিশ তিরিশ আশপাশ থেকে মিলেছিল তাম্র যুগের একটি তামার কুঠার। যাকগে সেসব প্রসঙ্গ। বরং বেলপাহাড়ির প্রকৃতির মাঝে কিছুটা ঘোরাঘুরি করা যাক।

তাই খ্যাঁদারানি দেখে গেলাম তারাফেনি। তারাফেনি জলাধার। ঘাঘরার কাছেই রয়েছে তারাফেনি জলাধার। সবুজের মাঝে টলটলে জলের এই জলাধার দেখতে বেশ লাগে। তারাফেনি যাওয়ার পথটি ভীষণ সুন্দর। অরণ্যের সবুজের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে তারাফেনি নদী। এই নদীর জল অন্যান্য নদীর মতো নয়, ঈষৎ অন্যরকম। আমরা যখন তারাফেনি ড্যামের দিকে যাচ্ছি তখন আকাশের আলো ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। আকাশ জুড়ে মেঘের হালকা আস্তরণ। গাড়ির চালক কেবলই বলছেন, "এখন মাঝে আর কোথাও দাঁড়াব না। এইসময় হাতি নামে। তারাফেনি ড্যামের ওপর দিয়ে হাতি চলাফেরা করে। না, শেষপর্যন্ত হাতির মুখোমুখি হইনি। খুব বড় ড্যাম নয়, তবে ভয়ংকর! চারদিকে তারাফেনির জলরাশি। মাঝেমধ্যে কোথাও কাশ মাথা চাড়া দিচ্ছে। সে অপূর্ব দৃশ্য! বিশেষ করে, মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে তারাফেনির জলে সূর্যাস্তের লালিমা!

তারাফেনি ড্যাম থেকে সামান্য দূরে ঘাঘরা ঝরনা। সাত-আট কিমি হবে। সন্ধ্যার বাতি জ্বলতে শুরু করবে কিছুক্ষণ পর। কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া নয়। জঙ্গলে সন্ধের মুখে তো নয়ই। তাই ফিরলাম হোটেলের পথে, পরদিনের সফরসূচিতে ঘাগরা রইল প্রথমে। গাড়ি এসে থামল রাস্তার ধারে। এখান থেকে জঙ্গলের ভিতর অনেকটা হাঁটাপথ ঘাগরা পৌঁছতে হলে। গরম চা খেয়ে শুরু হল পথচলা। শাল, পিয়াল, মহুয়া, সোনাঝুরি,

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ইউক্যালিপটাসের অরণ্য। ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা ঘাগরা যাওয়ার অফুরন্ত প্রাকৃতিক রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হতেই হয়, কোনও উপায় নেই!

বড় রাস্তা থেকে অনেকটাই পথ ঘাগরা। মাঝেমধ্যে যাওয়ার পথে কিছু কিছু মানুষের মুখ দেখা যায়। আদিবাসী মেয়ে তাঁর সন্তানকোলে দাঁড়িয়ে আছেন। গাইডও চলার পথে মিলে গেল। সামান্য অর্থের বিনিময়ে ওঁরা গাইডের কাজ করেন। বেশিরভাগই গ্রাম্য গৃহবধূ। কথা বলতে বলতে জানা গেল, রোজগার বলতে এটাই। বাড়ি ফিরে রান্নাবান্না হবে। যাইহোক, ঘাগরা ঝরনার কাছে প্রায় উপস্থিত হলাম। 'প্রায়' বললাম এই কারণে এখনও নামতে হবে নীচে বোল্ডার টপকে টপকে। তার আগে চা-অমলেট খাওয়া।

একবারে জঙ্গলের ভিতর ঘাগরা। খুব ছোট নয় ঘাগরা। বেশ গা-ছমছমে পরিবেশ! অরণ্যের বিশাল বিশাল গাছগাছালি নেমে এসেছে ঝরনার ওপর। স্থানীয় একজন বললেন, "ঝরনার গায়ে দেবতার মন্দির। রোজ পুজো হয়।" দেখলাম, স্থানীয় কয়েকজন যুবক স্নান করছেন ঘাগরার জলে নেমে। ওপর থেকে নেমে ঝরনার জল নীচে একটা প্রাকৃতিক স্নানের জায়গা সৃষ্টি করেছে। ঝরনা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সবমিলিয়ে অসাধারণ সুন্দর। শিল্পীর ক্যানভাসে একেবারে ছবির মতো! হাতে সময় থাকলে বেলপাহাড়ি থেকে সহজেই ঘুরে নেওয়া যেতে পারে সাদা পাহাড়, ঢাঙ্গিকুসুম ঝরনা, লালজল ইত্যাদি ইত্যাদি।

শীতের ছোট্ট ছুটিতে বেলপাহাড়ি অবশ্যই হতে পারে আপনার বা আপনাদের গন্তব্য। যাওয়ার জন্য যোগাযোগ করবেন বিধান দেবনাথ-এর সঙ্গে। উনি বেলপাহাড়ি সন্তানস্নেহে ভালবাসেন। বেলপাহাড়ি পর্যটনের উন্নতির জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করে চলেছেন। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক তিনি। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন। বিধানবাবুর একটি খাওয়ার হোটেল আছে-- কাঁচালঙ্কা। অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করেন তিনি। যোগাযোগ:08945876719.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১২। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির পাহড় মেঘমুলুকে

পাহাড়ি শহর শিলং বাঙালির একান্ত প্রিয় এবং স্মৃতিবিজড়িত। তার কারণ, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলং গেছেন আর তাঁর বাড়ি দেখেননি তেমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া মুশকিল! মেঘালয়ের পাহাড়ি শহর শিলং একেবারেই মেঘমুলুক। শিলংয়ের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় বহুকালের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও বেশি করে বাঙালি-জীবনের সঙ্গে শিলংকে জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর 'শেষের কবিতা' পড়েননি এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল। তাই শিলং চেনেন না বা জানেন না এমন বাঙালিও পাওয়া যাবে না।

ছবির মতো সুন্দর শিলং তা সেখানে না-গেলে বুঝতে পারবেন না, আমিও পারিনি। পুলিশ বাজারের কাছে যে হোটেলে ছিলাম, একদিন ভোরবেলা ঘরের জানালা খুলতেই একদল মেঘ এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। মেঘমুলুকে মেঘের আদরে স্বাগত জানালো মেঘেরা! মেঘ-কুয়াশা প্রবেশ করে জানালা দিয়ে বিছানাপত্র ভিজিয়ে দিল খানিক! বেশ লাগে ভোরের বেলা একাকী মেঘের সঙ্গে খেলতে, মেঘমুলুকে! জানালা দিয়ে উঁকি দিলে চোখে কুয়াশার চাদরে মুড়েছে সারা পাহাড়ি শহর। কুয়াশার চাদর সরিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। চোখে পড়বে চারপাশে পাহাড়, তারই ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে ঝরনা। সেইসব ঝরনা যেতে যেতে নদী হয়ে ভেসে যায়, কখনওবা হ্রদ হয়ে বাঁধা পড়ে থাকে তার জলশরীরে। পাইনের অরণ্য-চেরা পথ উধাও হয় দূরে কোথাও নাগালের বাইরে! প্রজাপতি তার নকশি-কাটা ডানায় উড়ে উড়ে ঘুরে যায় এক ফুল থেকে অন্য আর এক ফুলে। বৃষ্টি-স্পর্শ কুয়াশামাখা আকাশ-মিনার! ওগুলো খাসি, জয়ন্তী আর গারো পাহাড়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

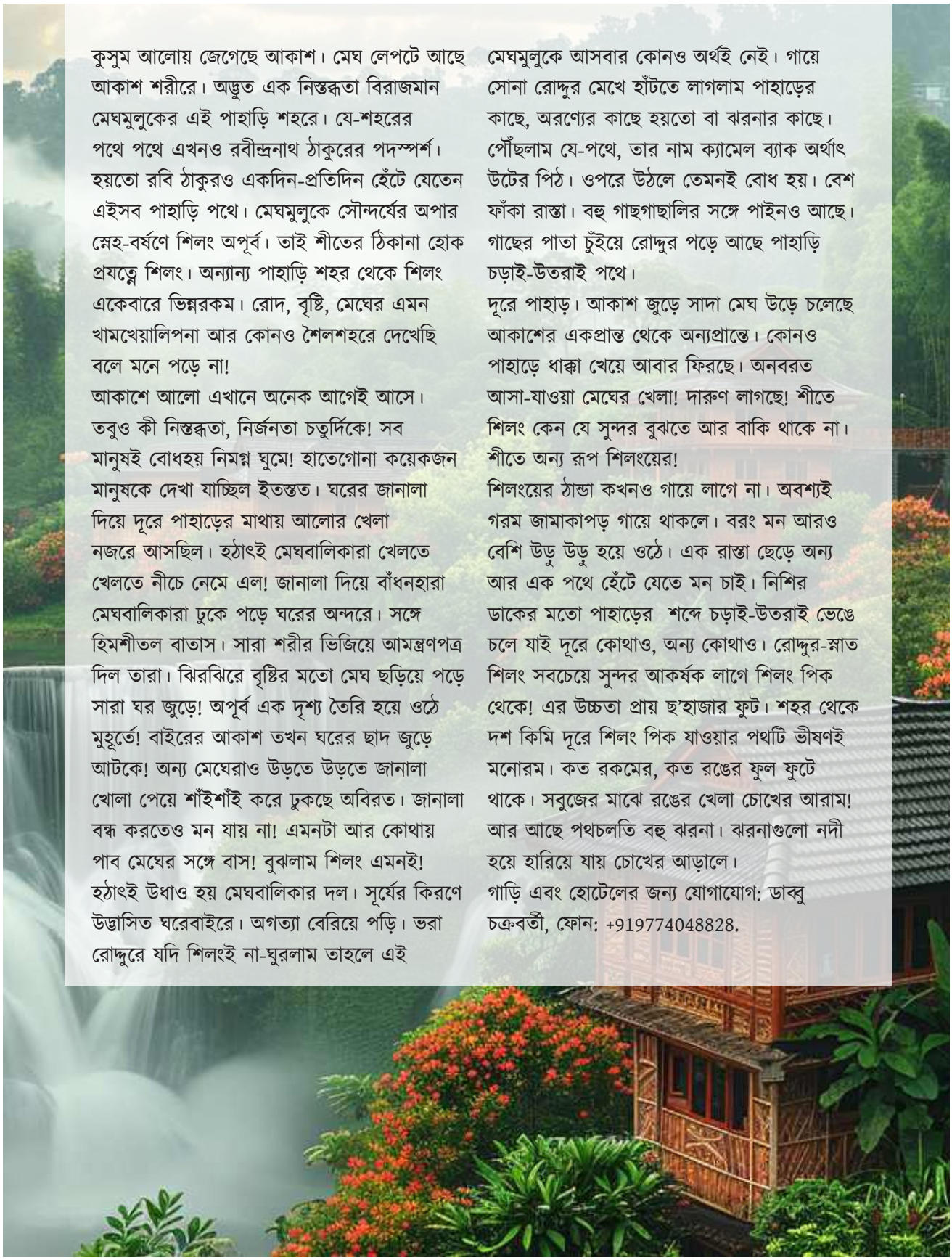

কুসুম আলোয় জেগেছে আকাশ। মেঘ লেপটে আছে আকাশ শরীরে। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা বিরাজমান মেঘমুলুকের এই পাহাড়ি শহরে। যে-শহরের পথে পথে এখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদস্পর্শ। হয়তো রবি ঠাকুরও একদিন-প্রতিদিন হেঁটে যেতেন এইসব পাহাড়ি পথে। মেঘমুলুকে সৌন্দর্যের অপার স্নেহ-বর্ষণে শিলং অপূর্ব। তাই শীতের ঠিকানা হোক প্রযত্নে শিলং। অন্যান্য পাহাড়ি শহর থেকে শিলং একেবারে ভিন্নরকম। রোদ, বৃষ্টি, মেঘের এমন খামখেয়ালিপনা আর কোনও শৈলশহরে দেখেছি বলে মনে পড়ে না!

আকাশে আলো এখানে অনেক আগেই আসে। তবুও কী নিস্তব্ধতা, নির্জনতা চতুর্দিকে! সব মানুষই বোধহয় নিমগ্ন ঘুমে! হাতেগোনা কয়েকজন মানুষকে দেখা যাচ্ছিল ইতস্তত। ঘরের জানালা দিয়ে দূরে পাহাড়ের মাথায় আলোর খেলা নজরে আসছিল। হঠাৎই মেঘবালিকারা খেলতে খেলতে নীচে নেমে এল! জানালা দিয়ে বাঁধনহারা মেঘবালিকারা ঢুকে পড়ে ঘরের অন্দরে। সঙ্গে হিমশীতল বাতাস। সারা শরীর ভিজিয়ে আমন্ত্রণপত্র দিল তারা। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো মেঘ ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘর জুড়ে! অপূর্ব এক দৃশ্য তৈরি হয়ে ওঠে মুহূর্তে! বাইরের আকাশ তখন ঘরের ছাদ জুড়ে আটকে! অন্য মেঘেরাও উড়তে উড়তে জানালা খোলা পেয়ে শাঁইশাঁই করে ঢুকছে অবিরত। জানালা বন্ধ করতেও মন যায় না! এমনটা আর কোথায় পাব মেঘের সঙ্গে বাস! বুঝলাম শিলং এমনই!

হঠাৎই উধাও হয় মেঘবালিকার দল। সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত ঘরেবাইরে। অগত্যা বেরিয়ে পড়ি। ভরা রোদ্দুরে যদি শিলংই না-ঘুরলাম তাহলে এই মেঘমুলুকে আসবার কোনও অর্থই নেই। গায়ে সোনা রোদ্দুর মেখে হাঁটতে লাগলাম পাহাড়ের কাছে, অরণ্যের কাছে হয়তো বা ঝরনার কাছে। পৌঁছলাম যে-পথে, তার নাম ক্যামেল ব্যাক অর্থাৎ উটের পিঠ। ওপরে উঠলে তেমনই বোধ হয়। বেশ ফাঁকা রাস্তা। বহু গাছগাছালির সঙ্গে পাইনও আছে। গাছের পাতা চুঁইয়ে রোদ্দুর পড়ে আছে পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পথে।

দূরে পাহাড়। আকাশ জুড়ে সাদা মেঘ উড়ে চলেছে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। কোনও পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরছে। অনবরত আসা-যাওয়া মেঘের খেলা! দারুণ লাগছে! শীতে শিলং কেন যে সুন্দর বুঝতে আর বাকি থাকে না। শীতে অন্য রূপ শিলংয়ের!

শিলংয়ের ঠান্ডা কখনও গায়ে লাগে না। অবশ্যই গরম জামাকাপড় গায়ে থাকলে। বরং মন আরও বেশি উড়ু উড়ু হয়ে ওঠে। এক রাস্তা ছেড়ে অন্য আর এক পথে হেঁটে যেতে মন চাই। নিশির ডাকের মতো পাহাড়ের শব্দে চড়াই-উতরাই ভেঙে চলে যাই দূরে কোথাও, অন্য কোথাও। রোদ্দুর-স্নাত শিলং সবচেয়ে সুন্দর আকর্ষক লাগে শিলং পিক থেকে! এর উচ্চতা প্রায় ছ'হাজার ফুট। শহর থেকে দশ কিমি দূরে শিলং পিক যাওয়ার পথটি ভীষণই মনোরম। কত রকমের, কত রঙের ফুল ফুটে থাকে। সবুজের মাঝে রঙের খেলা চোখের আরাম! আর আছে পথচলতি বহু ঝরনা। ঝরনাগুলো নদী হয়ে হারিয়ে যায় চোখের আড়ালে।

গাড়ি এবং হোটেলের জন্য যোগাযোগ: ডাব্বু চক্রবর্তী, ফোন: +919774048828.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১৩। দুবলাগাড়ি নিস্তব্ধতার সৈকত

এমন সমুদ্রসৈকত আর দুটি আছে কিনা জানা নেই। নির্জনতা, নিস্তব্ধতার অপর নাম দুবলাগাড়ি। সমুদ্রের পাড়ে অনবরত ঢেউ এসে ভাঙে। ঢেউয়ের শব্দে শিহরন জাগে শরীরে। সমুদ্রবিলাসী পর্যটকের অনুপস্থিতিতে লাল কাঁকড়ার দল গর্ত থেকে বেরিয়ে রৌদ্রস্নান করে। দূর থেকে মনে হয় যেন লাল কার্পেট বিছিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে দুবলাগাড়ি সমুদ্রসৈকত। আবার পর্যটকের পদশব্দে মুহূর্তে ফাঁকা। লাল কাঁকড়া কই। খুঁজে পাবেন কী করে, তারা তো সেঁধিয়েছে গর্তে! তখন মনে লাল কার্পেট যেন গুটিয়ে নেয় সমুদ্র। পড়ে থাকে কেবলমাত্র রোদ্দুর আর তীরভাঙা ঢেউয়ে ভেসে আসে শঙ্খ-ঝিনুক। কখনও সখনও মাছ।

দুবলাগাড়ি সমুদ্রসৈকতের একপাশে বিশাল ঝাউয়ের অরণ্য। ওই অরণ্য মাঝে ঘুরতে ঘুরতে বেশ একটা গা-ছমছমে ব্যাপার খেলা করে শরীরে! বিশেষ করে, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে। চারিদিকে শিয়ালের হুক্কাহুয়াত ঐকতান শুনলেই হাড় হিম হয়ে যাওয়ার জোগাড়! না, কোনও ভয় নেই। শিয়ালরা মানুষের কাছাকাছি হয় না। না-হওয়াই তো ভাল। তবে বিশাল বিশাল গাছের ফাঁকে পথ খুঁজে খুঁজে রিসর্টের দিকে যাওয়ার পথটি খুব মসৃণ নয়। তবে ভয়েরও কোনও ব্যাপার নেই।

দুবলাগাড়ি সমুদ্রসৈকতটি চমৎকার। শান্ত-নিরিবিলি। শঙ্খচিল উড়ে যায় মাছধরা ট্রলারের পিছু পিছু। সমুদ্রের বুকে ভেসে চলে ট্রলার আর ছোট জেলেডিঙিও। সমুদ্রের শান্ত জলে ভেসে থাকে, মাছ ধরে। মনে হয় যেন পটে আঁকা ছবি! সূর্য তার কখনও রূপালি আলো ছড়িয়ে আবার কখনও তার লালিমা ছড়িয়ে দেয় আকাশময় তখন সমুদ্রের জলে তার প্রতিফলন ঘটে। কখনও কখনও মনে হয় গলানো রুপো সমুদ্রের জলে পড়ে আছে! সে এক অবর্ণনীয় রূপ-মাধুর্যের দ্যোতনা হয় সমুদ্রসৈকত জুড়ে!

ওড়িশার অপূর্ব সুন্দর সৈকতটির 'বাগদা বিচ' নামেও পরিচিত। এখানে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ হয়তো নেই কিন্তু ঝাউয়ের জঙ্গল, সূর্যাস্ত, পাখির ডাক, নিরিবিলি-নির্জনতা সবমিলিয়ে দু'তিনটি দিন দিব্য কাটানো যায়। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মনকাড়া!

কী ভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে কমবেশি ২৪৫ কিমি দুবলাগড়ি। ট্রেনে বালেশ্বর বা বালাশোর। স্টেশনের বাইরে থেকে অটো বা গাড়িতে দুবলাগড়ি। রিসর্টে বলে রাখলে ওরা গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। অটো ৭০০ টাকা, গাড়ি ১০০০ টাকা। কলকাতা থেকে গাড়িতেও যেতে পারেন। এন এইচ-১৬ ধরে। সময় লাগবে ঘণ্টা চার-পাঁচ মতো।

কোথায় থাকবেন: ওশান ব্রিজ রিট্রিট। থাকা-খাওয়া সমেত মাথাপিছু প্রতিদিন ১৮০০ থেকে ২৭০০ টাকা। রিসর্টে পৌঁছলেই প্রথমেই হাতে একটি বিশাল সাইজের ডাব দেওয়া হয়, যাকে বলে-- Welcome Drinks. যোগাযোগ: 8093092360.

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১৪। লাল কাঁকড়ার দেশে যা

দুয়ারে সমুদ্র। শুধু সমুদ্র নয়, একটা গোটা সি বিচ-ও। নামখানা থেকে টোটোতে পৌঁছানো যায় লাল কাঁকড়ার দেশে, লাল কাঁকড়ার সৈকতে। লালগঞ্জ সমুদ্রসৈকত হিসেবে জনপ্রিয়তা পেলেও স্থানীয় এক সাংবাদিক জানালেন আদতে ওটা লয়ালগঞ্জ। লোকমুখে লালগঞ্জ।

লালগঞ্জ বা লয়ালগঞ্জ সমুদ্রসৈকতটি ভীষণই নিরিবিলি, নির্জন, শান্ত। শান্ত এখানকার সমুদ্রও। ছোট ছোট ঢেউ এসে চুম্বন করে যায় বালিয়াড়ির বুকে। সমুদ্রের কাছে ধরা দিলে ছোট ছোট ঢেউ পদযুগল ধুয়ে দিয়ে আবার সমুদ্রের বুকে চলে যায়। ঢেউয়ের আসা-যাওয়ার ফাঁকে জেলেডিঙি আর ট্রলারগুলো সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় ভেসে যায় মৎস্য শিকারের আশায়। ফিরে আসে তীরে। প্রচুর মাছ ধরা পড়েছে জালে। সেগুলো ফাঁকা করতে ছোট ছোট হাতে টানা ভ্যান সমুদ্রের জলের ভিতর নেমে যায়। তারা মাছ নিয়ে আড়তে চলে যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি দেখতে বেশ লাগে। বোঝা যায়, মানুষের সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্ক কী নিবিড়! জীবন কত কঠিন, বেঁচে থাকার লড়াই। প্রকৃতি আর মানুষ এক হয়ে যায়।

বিশাল সমুদ্রতটের গা-ঘেঁষে সারি দিয়ে রয়েছে ঝাউগাছ। নিরিবিলি নির্জন সৈকতের টানেই সমুদ্রের কাছে যান সমুদ্রপ্রেমী কিংবা সমুদ্রবিলাসীরা। ঝাউয়ের অরণ্যে দিনভর পাখির ডাক বা কলকাকলি গোটা সামুদ্রিক পরিবেশেই একটা দারুণ মাদকতা এনে দেয়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসেই কাটিয়ে দেওয়া যায় সমুদ্র-ঘেঁষা ঝাউয়ের অরণ্যে। সঙ্গে আছে উপরি পাওনা সমুদ্রসৈকত জুড়ে লাল কাঁকড়ার দাপাদাপি আর তাদের দেখা পাওয়া। লাল কাঁকড়ার দল যখন সমুদ্রের তট জুড়ে বিছিয়ে থাকে তখন দূর থেকে মনে হয়, কেউ বুঝি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে পলাশ। আবার মানুষের চলাফেরার শব্দে যখন গর্তে ঢুকে যায় তখন ফাঁকা লাগে ভীষণ। তখন কেবল দৃষ্টি পড়ে সমুদ্রের শরীর থেকে উঠে আসা ছোট ছোট ঢেউয়ের পানে। তারা তীরে এসে সৈকতে ভেঙে পড়ে। ছোট ছোট ঢেউয়ের তো গর্জন থাকে না, থাকে নূপুরের ছন্দ, নূপুরের রিনিঝিনি শব্দ! তাই এককথায় বঙ্গোপসাগরের তীরে নিরিবিলিতে ছোট্ট শীতের ছুটি বা সপ্তাহান্ত কাটানোর সেরার সেরা ঠিকানা-- লালগঞ্জ বা লয়ালগঞ্জ।

কীভাবে যাবেন: ট্রেনে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে নামখানার গাড়ি। নামখানা নেমে তার পর টোটোতে লালগঞ্জ বা লয়ালগঞ্জ। কলকাতা থেকে গাড়ি করেও যাওয়া যায়।

তবে গাড়িতে গেলে মন ভরে যাবে। বাইপাস হয়ে বারুইপুর হয়ে যাওয়া। কিংবা কুলপি-বকখালি রোড নামখানা। দুটি রুটই অপূর্ব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর ভিতর দিয়ে যাত্রা। কোথাও ভেড়ি, কোথাওবা গ্রামবাংলার সবুজ খেত, দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ। যা চোখের আরাম, মনের আরাম! সবচেয়ে ভাল লাগে নামখানা ব্রিজের ওপর থেকে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী দেখা। সে এক চমৎকার দৃশ্য।

থাকবেন কোথায়: যোগাযোগ: সুকুমার দোলোই, ফোন: +918584868495. এঁকে ফোন করুন উনিই সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১৫। পোড়ামাটির দেশে

পোড়ামাটির দেশ বলতেই চোখে ভাসে লালমাটির দেশ বাঁকুড়ার কথা। বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের কথা। বিষ্ণুপুর মানেই পোড়ামাটির অর্থাৎ টেরাকোটার মন্দির, দশাবতার তাস, বালুচরি শাড়ি, শঙ্খের কাজ, শাঁখার কাজ আর অবশ্যই বিষ্ণুপুর লণ্ঠন। ইতিহাসের শহরে শিল্পকলা, সংস্কৃতির চর্চা, সব একইসঙ্গে। বিষ্ণপুর খুব পুরনো একটি শহর। প্রাচীন মল্লরাজাদের রাজধানী। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই রাজ্যের সীমানা, একদিকে খড়্গপুর অন্যদিকে ছোটনাগপুরের দুর্গম অঞ্চল। এঁরাই শেষ হিন্দু রাজা। ১৫৮৭ থেকে ১৭১২ ছিল মল্লরাজাদের স্বর্ণসময় কাল। ৫৪তম মল্লরাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের সময়কালে শিল্প, সংগীত, স্থাপত্য-- সবকিছুতেই খ্যাতি শিখরে ওঠে বিষ্ণুপুর। শ্রীনিবাস আচার্যের আগমনে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিষ্ণুপুর। শ্রীনিবাস আচার্য মল্লরাজাদের সহযোগিতায় বিষ্ণুপুরকে ‘গুপ্ত বৃন্দাবন’ তীর্থ করে তোলেন।
টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরগুলো আজও শিল্প-সংস্কৃতির সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামরাই, জোড়বাংলো, রাসমঞ্চ ইত্যাদি ইত্যাদি মন্দির স্থাপত্য বিষ্ণুপুরের গৌরবময় দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ করে, রাসমঞ্চের স্থাপত্যটি দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়!
আছে দলমাদল কামান, গড়দরজা, লালগড় ইত্যাদি মল্লরাজাদের বীরত্বের সাক্ষী বহন করে। লালবাঁধের সামনে মনে পড়ে সেকালের অসামান্যা নর্তকী লালবাঈয়ের কথা। রাজা রঘুনাথ যাঁর প্রেমের বন্যায় ভেসে গেছিলেন। ওঁদের প্রেমকাহিনি সাহিত্যিকের কলমে অমর হয়ে আছে। কিংবদন্তি আছে, এই বাঁধের গভীর জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল নর্তকী লালবাঈকে। তাঁকে ডুবিয়ে মারার নির্দেশ নাকি এসেছিল রানি চন্দ্রপ্রভার কাছ থেকে। পরবর্তী সময়ে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেন রানি চন্দ্রপ্রভা।
এখন সবই ইতিহাস। তবে সেইসব ইতিহাসের সাক্ষী বিষ্ণুপুর আজও তার গরিমায় উজ্জ্বল। সেই ইতিহাসের সঙ্গী, বিষ্ণুপুরের শিল্পকলার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। যেতে বিষ্ণুপুর। শীতকালে বিষ্ণুপুর অপূর্ব! শীতে বিশাল মেলাও বসে। বিষ্ণুপুরে দেখবার অনেককিছুই আছে। অবশ্যই দেখবেন, ‘আচার্য

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'। এখানকার সংগ্রহ মুগ্ধ করে।

ইতিহাসের আলিন্দ ছেড়ে প্রকৃতির কাছে যেতে পারেন মুকুটমণিপুর। এখন তো খুবই জনপ্রিয় বেড়ানোর জায়গা। পূর্ণিমার রাতে মুকুটমণিপুর অবর্ণনীয় সুন্দর। শুশুনিয়াও আছে। এখানকার প্রকৃতির রূপ-মাধুর্যে মোহিত হবেনই। সারা শীতে বহু প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের সমাগম হয় এখানে।

বিষ্ণুপুর থেকে কমবেশি আধঘণ্টা লাগে জয়পুর জঙ্গল যেতে। ঘুরে আসুন একদিন। এই জঙ্গল হল হাতি, হরিণের মুক্তাঞ্চল! বুনো শুয়োরও আছে, আছে ময়ূরও। শীতের দুপুরে বনজ গন্ধ পাবেন! মুগ্ধ করে দেবে অরণ্যের বাতাস, পাতা খসার শব্দে শিহরিত করবে মন। এই বুঝি হাতি এসে দাঁড়াল! প্রকৃতির মাঝে নিজেকে মেলে দেওয়ার অনাবিল আনন্দের সঙ্গে আছে ইতিহাসের স্পর্শ!

খুব দূরে নয়, শান্ত, নির্জন প্রকৃতি ঝিলিমিলি। অপূর্ব নিস্তরঙ্গ এক প্রকৃতি। মন ভাল করে দেবে এখানকার প্রাকৃতিক রূপমাধুরী! এখানে হাতি দর্শন হয়ে যেতে পারে যখন-তখন। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ, মাটির পথ আর শাল-পিয়ালের অরণ্য, ছোট ছোট টিলা সবমিলিয়ে ঝিলিমিলি লা-জবাব! আছে নৈশব্দের অরণ্য সুতান। শাল, সেগুন, ইউক্যালিপটাস, পলাশ, অর্জুন গাছের সমারোহ। অরণ্যের কাছে গেলে সবুজের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই!

কিছুটা দূরেই বিহারীনাথ পাহাড়। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট শিবমন্দির। চারিদিকে কেবলই সবুজ। তবে খুব দূরে নয় জয়রামবাটি। সারদা মায়ের জন্মস্থান। মাতৃমন্দিরের কাছেই মায়ের পুরনো বাড়ি আর নতুন বাড়ি। মাটির পুরনো বাড়িতে মা ছিলেন বহুকাল আর নতুন বাড়িতে শেষ চারটি বছর। জয়রামবাটিতে সিংহবাহিনী দেবীর যে-মূর্তিটি আছে সেটি সারদা মা নিজে পুজো করতেন। তিনি শুধুমাত্র যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের সহধর্মিণী ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সংঘজননী। সারা বিশ্বের কাছে জয়রামবাটি হল তীর্থক্ষেত্র।

বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে শীতের ছোট্ট ছুটি যে আপনার অন্যরকমভাবে কাটবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে হাওড়া- চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার পাবেন রাত্রিবেলা। ভোরবেলা পৌঁছে যাবেন বিষ্ণুপুর। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস আছে। এসপ্ল্যানেড থেকে প্রচুর বাস আছে বিষ্ণুপুর যাচ্ছে।

থাকবেন কোথায়: বিষ্ণুপুরে প্রচুর থাকবার জায়গা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটনের লজ আছে। খুব সুন্দর। আগে থেকে বুক করে রাখতে পারেন। ডালহৌসির অফিস থেকে বুকিং করা যায়।

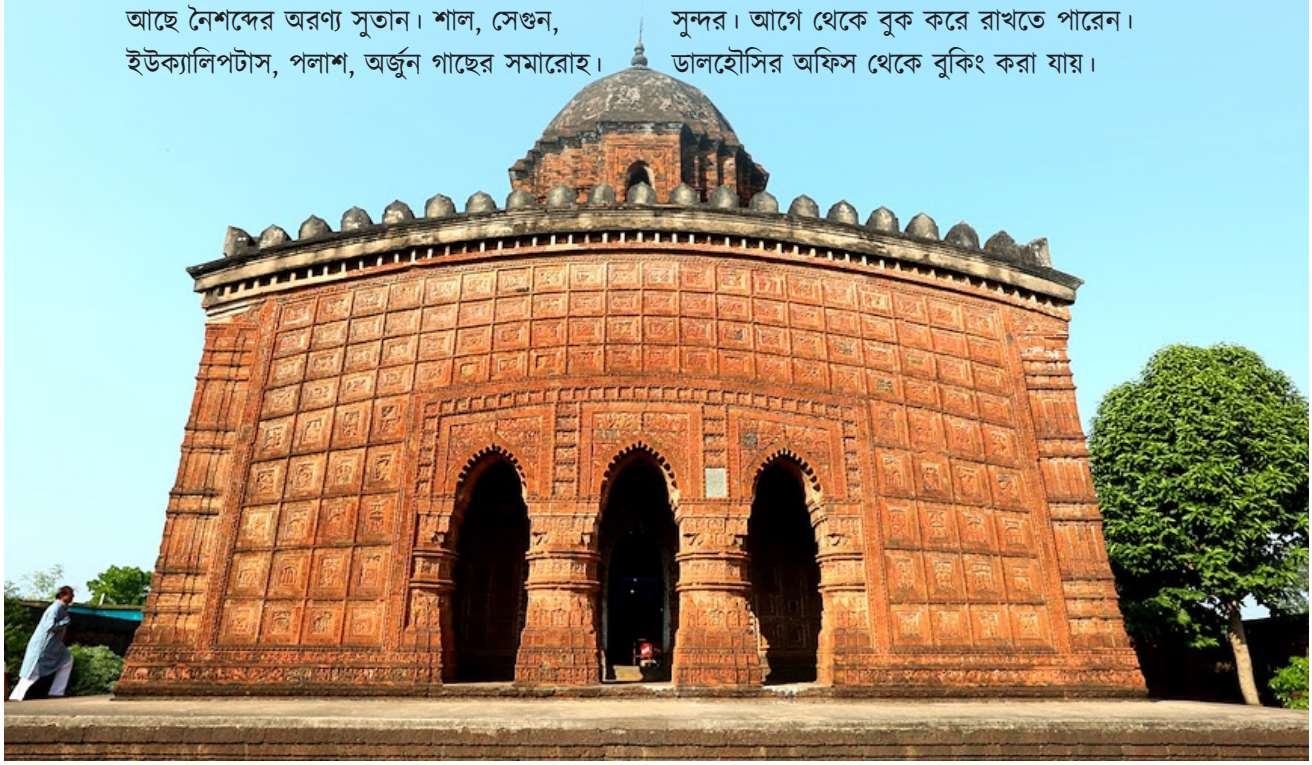

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পিকনিকের সেরা স্পট

কোন শব্দটি আপনার প্রিয়? বনভোজন, চড়ুইভাতি নাকি পিকনিক। বনভোজন বললে তবুও অনেকেই বোঝেন কিন্তু চড়ুইভাতি? কেউ কেউ মাথা চুলকোবেন। চেষ্টাচরিত্র করে হয়তো উত্তর মিলতে উত্তরদাতার কাছে। কিন্তু পিকনিক। সবাই হইহই করে উঠবেন। কবে, কোথায় যাওয়া হবে? আমার কিন্তু চড়ুইভাতি শব্দটি ভীষণ প্রিয়, বনভোজনও। যাইহোক, শীতের হিমেল উত্তুরে বাতাস সঙ্গী করে চড়ুইভাতি, বনভোজন বা পিকনিকে চলুন। রোজকার যাপনচিত্রে কিছুটা রং লাগে পিকনিকে।

আগের মতো আর নেই বর্তমানে পিকনিকের আদলটাই বদলে গেছে। পূর্ব পরিকল্পনা মতো পিকনিকের জায়গা ঠিকঠাক না-করে গেলে জায়গা পাওয়া দুষ্কর। তার ওপর কর্পোরেট পিকনিক হয়ে ছবিটারই বদল হয়েছে। যাক গে, বছরে তো একবার পিকনিক যাওয়া। আগে যেমন গঙ্গা নৌকা নিয়ে ভেসে পড়া। রান্নাবান্না সব নৌকাতেই। মাঝিভাইয়েরাও একটুআধটু হাত লাগাতেন। বেশ ছিল সেসব দিন। লম্বা একটা বাঁশের মাথায় চোঙা লাগিয়ে গান বাজানো হত। সেদিনকার সেইসব পিকনিকে দু'টি বিশেষ গান বাজত। একটি মান্না দে'র 'আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না' আর কিশোরকুমারের 'চলো যাই চলে যাই দূর বহুদূর, গায়ে মেখে জরি বোনা সোনা রোদ্দুর'। চোঙায় গান বাজতে বাজতে নৌকা পৌঁছে যেত, কখনও ব্যারাকপুর আবার কখনওবা অন্য কোথাও। এখনও গঙ্গাবক্ষে পিকনিক করতে দেখা যায়। তবে নৌকায় নয়, বড় স্টিমারে বা বিলাসবহুল লঞ্চে। বদল তো হবেই। পুরনোটাই যেমন সত্যি ছিল, বর্তমানও তেমনই সত্যি। যাইহোক না কেন, বেশকিছু পিকনিক স্পটের খোঁজখবর রইল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১। ত্রিবেণী পার্ক

পোশাকি নাম কেশোয়াড়ি ত্রিবেণী পার্ক। ত্রিবেণী পার্ক কেন? রূপনারায়ণ, মুণ্ডেশ্বরী আর দামোদরের একটি শাখা নদীর মিলনস্থল। রূপনারায়ণ নদীর একেবারে কোল ঘেঁষে এই পার্কটি। রূপনারায়ণের বুকে ভেসে তিন নদীর ত্রিবেণী সঙ্গমে যেতে পারেন। দিগন্তব্যাপী জলরাশি! না, ভয়ের কিছু নেই। 'সোনার তরী' ফেরি সার্ভিস থেকে বোটে চাপার সময়ই লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়। না পরলে বোটে ওঠার অনুমতি মেলে না।

পার্কের ভিতরও রয়েছে বিশাল এক দিঘি। সেখানেও বোটিং করা যায়। পিকনিকের ফাঁকে দেদার মজা। পিকনিকের জন্য দশটি শেড আছে। সেখানে রান্নাবান্না ইত্যাদি করা যায়। না-পাওয়া গেলে আশপাশে করা যায়। পিকনিকের জন্য অর্থ লাগে।

অপূর্ব সুন্দর এই 'কেশোয়াড়ি ত্রিবেণী পার্ক'টি। নদীর সৌন্দর্য ছাড়াও সবুজের রূপমাধুরী ছড়িয়ে। শীতের মরশুমি ফুল ফুটে থাকে সবুজের মাঝে। ছবির মতো! পিকনিক কিংবা বেড়ানোর জন্য আদর্শ জায়গা এই পার্ক।

যাবেন কীভাবে! হাওড়া দক্ষিণ শাখার ট্রেন ধরে কোলাঘাট স্টেশন। বাইরে ম্যাজিক গাড়ি সওয়ারির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। উঠে পড়ুন। মাথাপিছু ২৫-৩০ টাকা ভাড়া। যাবে সিবড়া। না, সোজাসাপটা যাওয়া যায় না ত্রিবেণী পার্ক। সিবড়া থেকে সামান্য দূরে এই পার্ক। টোটো পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাস থেকে পার্ক খোলা থাকবে সকাল ১০ থেকে। বিস্তারিত জানার জন্য একদিন চলে যান বেড়ানোও হবে, সঙ্গে পিকনিকের পরিকল্পনাও করে নেবেন।

২। বনলতা ফার্ম হাউস

'বনলতা' আর কবি জীবনানন্দ দাশকে আলাদা করা যায়, যায় না। বনলতা নামের সঙ্গেই যেন কবিতা লুকিয়ে বা জড়িয়ে আছে! তেমনই বনলতার সৌন্দর্য আর কবিতা ছড়িয়ে আছে বনলতা ফার্ম হাউসের চারিপাশের প্রকৃতিতে! গাছগাছালি আর জলাশয় জায়গাটির রূপমাধুরী বৃদ্ধি করেছে আরও বেশি। নিরিবিলি শীতের দুপুরে কানে আসে পাখির ডাক। সে বড় মধুর সময়, ভাললাগার মুহূর্ত! সকাল থেকে দুপুর তারপর বিকেল নামে ফার্ম হাউসের

মাঠে। তখন মনে হয়, প্রকৃতি কত সুন্দর, কত মধুর! অপূর্ব লাগে সেইসময়!

সায়েন্স সিটি কিংবা রুবি থেকে কিছুটা দূরেই বনলতা ফার্ম হাউস। কমবেশি ঘণ্টাখানেক লাগে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পিকনিকের আদর্শ জায়গা। ওয়াশরুম-সহ ঘরের জন্য ২০০০টাকা। খাওয়া মাথাপিছু ৯৫০ এবং ৮৫০টাকা। যোগাযোগ: 98300 11715.

৩। গঙ্গানীড় ভিলা

বাড়িটি একেবারে গঙ্গার ধারে। দুটি ঘর, ওয়াশরুম ইত্যাদি ইত্যাদি সব সুবিধা আছে। যদি একটি পরিবার কিংবা একটি গ্রুপ বেড়াতে যান, তাঁরা পুরো বাড়িটি নিয়ে থাকতে পারেন। ভাড়া সেক্ষেত্রে ৭০০০ হাজার টাকা।

আর পিকনিকের জন্য দুটি ঘরের ভাড়া ৩৫০০ এবং ২৫০০ টাকা।

নদীর ধারে, সে নদী যদি হয় গঙ্গা তাহলে তো কথাই নেই, দু'একটি চমৎকারভাবে কেটে যাবে। 'গঙ্গানীড়'-এ রাত্রিযাপন করা একজন বললেন, "দুটো দিন কীভাবে যে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। গঙ্গার ধারে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে।" 'গঙ্গানীড়' ঠিক রিসোর্ট নয়, বাংলো বা ভিলা বলা যেতে পারে। ফলতার রাজারামপুর গ্রামে একেবারে গঙ্গার ধারে এই ভিলাটি। তারাতলা থেকে মাত্র ৪২ কিমি। ট্রেনে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে ডায়মন্ড হারবার লোকাল ধরে প্রান্তিক স্টেশনে নেমে অটোতে মিনিট চল্লিশ।

বাড়িটিতে সর্বত্র রুচির ছাপ। ঘর দুটি পুরনো দিনের আসবাবে সাজানো। আছে একটা সুইমিং পুল, মাছ ধরার পুকুর, সেখানে ছিল ফেলে বসে থাকুন, অবশ্যই যাঁদের মাছ ধরার নেশা রয়েছে তাঁদের উদ্দেশে বলা। বিশাল সবুজ লন, মরশুমি ফুল ফুটে আছে। অজস্র প্রজাপতি উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফুলে ফুলে! গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা আছে। বাচ্চাদের জন্য কিছু ইনডোর গেমস আছে। বাড়ির বয়স্ক মানুষজন থাকলে অসুবিধা নেই। হুইলচেয়ার-এর সুবন্দোবস্ত আছে। সবমিলিয়ে বেশ ভালোই লাগে। বেশ একটা সাবেকিয়ানা ছাপ বিদ্যমান।

যাঁরা থাকবেন তাঁদের জন্য ব্রেকফাস্ট কমপ্লিমেন্টারি, খাবারের স্বাদ ও পরিমাণ দুটোই একেবারে ঠিকঠাক।

কীভাবে আসবেন ও বুকিং করবেন: বেহালা ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে বাখরা হাট রোড ধরে ডোঙাড়িয়া বুরুল হয়ে খুব সহজেই এখানে চলে আসা যাবে। ট্রেনে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন থেকে অটো পেয়ে যাবেন , ৪০ মিনিটের মতো সময় লাগবে। বুকিং করতে পারবেন ওয়েবসাইট থেকে। https://ganganeervilla.com/

ফোন: 98300 11715.

৪। আম্রকুঞ্জ পিকনিক গার্ডেন

'ঘরের কাছেই পেয়ে গেলাম এক আস্ত আরশি নগর', আম্রকুঞ্জ পিকনিক গার্ডেনে পৌঁছলে সেই অনুভূতিই হবে! আর সেই আরশি নগরের আম্রকুঞ্জে পিকনিক হবে না, তা হয় নাকি! কুঞ্জে প্রবেশ করলেই চারিপাশে উৎসব উৎসব মেজাজ! পিকনিকের আদর্শ ঠিকানা। বিশাল এলাকা নিয়ে আম্রকুঞ্জ পিকনিক গার্ডেনের। চারিপাশে গাছগাছালি, আর ফুলেল সৌন্দর্য, সবমিলিয়ে আম্রকুঞ্জ অপূর্ব।

শীতের হিমেল বাতাসের সঙ্গে রোদ্দুর খেলা করে যায় গাছগাছালির পাতায় পাতায়। গাছের ফাঁকে চুইয়ে পড়া রোদ্দুর পড়ে থাকে সবুজ মাঠে। মনে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হবে, প্রকৃতি আপন খেয়ালে মেতে উঠেছে আলো-আঁধারির খেলায়! পিকনিকের আনন্দে গা-ভাসিয়ে দিন গাছতলায় মেতে উঠুন পিকনিকে। পিকনিকের হইহল্লায় কেটে যাবে সময়। চমৎকার পরিবেশ আম্রকুঞ্জের!

পিকনিক স্পটের ভাড়া-- ৫০০, ৭০০, ২৫০০, ৩৫০০ টাকা। তবে কমিনিউটি রুম ব্যবহারের জন্য আলাদা কোনও টাকা লাগে না। এখানেই আছে ওয়াশরুম। পিকনিকের বাসনপত্র নিয়ে আসতে পারেন। কর্তৃপক্ষকে বললে তাঁরা ব্যবস্থা করে দেবেন। তার জন্য আলাদা টাকা লাগে। এমনকী, ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থাও আছে আম্রকুঞ্জে। লাগলে আগে থেকে জানাতে হবে। এর জন্য আলাদা টাকা লাগবে।

কীভাবে যাবেন: সড়কপথে দিল্লি রোড ধরতে হবে। মানকুণ্ডু স্টেশনের দিকে রাস্তা ধরে তিন কিমি মতো গেলেই আম্রকুঞ্জ পিকনিক গার্ডেন। ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে ব্যান্ডেলগামী ট্রেনে মানকুণ্ডু স্টেশন নেমে পাঁচ মিনিট হাঁটাপথ। যোগাযোগ: 94337 60749.

৫। কঙ্কনা বিনোদন উদ্যান

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙারর কঙ্গনা বিনোদন উদ্যান পিকনিকের জন্য এক আদর্শ স্পট। কঙ্কনা বাঁওড় হিসেবে পরিচিত। এই বাঁওড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। গোবরডাঙার পরিচিতি নাটকের শহর হিসেবে। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন একটি মন্দিরে বসে। সেই মন্দির আজও বিদ্যমান।

গোটা উদ্যানে মোট ৬০টি পিকনিক স্পট রয়েছে। উদ্যান খোলা থাকে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা।

গাড়িতে এলে হাবড়ার চোংদা মোড় থেকে মছলন্দপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তা ধরে পৌঁছে যাবেন এই ঠিকানায়। নতুবা গুগল ম্যাপ দেখে অনায়াসে পৌঁছে যাবেন। ইংরেজি পুরনো বছরের শেষে কিংবা নতুন বছরের শুরুতে পিকনিকে যেতে পারেন, ভাল লাগবে। গোবরডাঙা কঙ্গনা বিনোদন উদ্যান পিকনিকের জন্য এক আদর্শ স্পট। বিশাল এলাকা জুড়ে এই উদ্যান। এখানে আছে বহু

পিকনিক স্পট। তবে এবার সম্ভবত সব ক'টি পিকনিক স্পট দেওয়া যাবে অসুবিধার কারণে। ৬০০ টাকার বিনিময়ে যে-পিকনিক স্পটটি আছে সেটিই কেবলমাত্র দেওয়া হবে, ৫০০ টাকারটি নয়। পার্কিং-এর ক্ষেত্রেও তাই। ১০ টাকার বিনিময়ে শুধুমাত্র বাইক পার্কিং হবে ভিতরে। বড় গাড়ি বাইরের মাঠে। এই উদ্যানে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য আছে বহুকিছুর ব্যবস্থাও। বলে রাখা প্রয়োজন পিকনিক স্পট ছাড়াও এখানে রেস্ট রুম ভাড়া

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই ধরনের রেস্ট রুম রয়েছে। সাধারণ রেস্ট রুম ৫১০ টাকা। স্পেশাল রেস্ট রুম ১০১০ টাকা।
উদ্যানে পিকনিক স্পট ভাড়া করে নিজেরা রান্নাবান্না করে আনন্দ উপভোগ করতে বেশ লাগবে। বাঁওড়ের ধারে মনোরম পরিবেশে সময় কেটে যায় সাবলীল। শীতকালে দেখা মেলে পরিযায়ী পাখিরও। নিজেরা রান্নাবান্নার বাসনপত্র সঙ্গে আনলে তো ঠিক আছে, নইলে এখানকার কর্মীদের আগেই জানিয়ে দিন ব্যবস্থা করে দেবেন। পিকনিক স্পট ভাড়া গিয়ে করতে হবে। তাই আগেভাগে জায়গা দেখে নিন, বুকিংও করে রাখুন। যাঁরা ট্রেনে আসবেন তাঁদের বলে রাখি, শিয়ালদা থেকে বনগাঁ লাইনের ট্রেন ধরে নামতে হবে গোবরডাঙা স্টেশন। তারপর টোটো-অটোতে কঙ্কনা বাঁওড় বা বিনোদন উদ্যান। খোঁজখবরের জন্য ফোন: 6296018310. আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিই ফোনে কোনওরকম বুকিং করা বা নেওয়া হয় না।

৬। ফুলেশ্বর

বাঙালির কিছু কিছু ব্যাপারে চিরকালীন পছন্দ আছে। সেখানে কোনওকিছুর সঙ্গে আপোষ করতে নারাজ। যেমন, সিনেমায় উত্তম-সুচিত্রা, গানে হেমন্ত-সন্ধ্যা, জাদুতে পিসি সরকার, রসগোল্লা

কেসি দাশ, সন্দেশ নকুড়, ভ্রমণে দিঘা পুরী দার্জিলিং ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক তেমনই পিকনিকে ফুলেশ্বর। বাঙালির সেই বনভোজন বা চড়ুইভাতি থেকে ফুলেশ্বর যাওয়ার শুরু। পিকনিক শব্দটি তখনও বাঙালির কাছে অত জনপ্রিয় ছিল না। যাঁরা নিয়মিত পিকনিক করেন বা যান, তাঁদের কাছে অতিপরিচিত ফুলেশ্বর। বর্তমানে তো নতুন নতুন বহু পিকনিকের বহু জায়গা হয়েছে!
বাংলায় বহুল পরিচিত একটি কথা আছে, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। ফুলেশ্বর পিকনিক স্পটটিও তেমনই নতুন নতুন পিকনিকের জায়গা যতই হোক ফুলেশ্বরের চাহিদা মোটামুটি একইরকম রয়ে গেছে। গঙ্গার ধারে গাছগাছালি ঘেরা অতি উত্তম জায়গা। মনোমতো জায়গা বেছে নিয়ে জাস্ট বসে পড়ো।
এখানে রয়েছে একটি সেচ দফতরের বাংলো। ব্যবস্থা করতে পারলে তার চেয়ে ভাল কিছু আর হয় না। বারান্দায় বসে বসে কেবলই নদীর রূপ-মাধুর্য উপভোগ করা! দেখা যাবে, দূরে নৌকাগুলো গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। সেইসঙ্গে শীতের শীতল বাতাসে পরিবেশ হয়ে উঠবে রোম্যান্টিক!
কীভাবে যাবেন: সড়কপথে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে যেতে হবে। গুগল ম্যাপ দেখে যাবেন। হাওড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণ শাখার মেচেদা, খড়গপুর বা মেদিনীপুরগামী ট্রেনে ফুলেশ্বর নেমে যেতে হবে। তারপর স্টেশনের বাইরে এসে যেতে হবে পিকনিক স্পট।

৭। মুখার্জির বাগান, সুন্দরবন

সুন্দরবনের নাম আঁতকে উঠলেন! না, না, আঁতকে ওঠার কোনও কারণ। কলকাতা থেকে সোজা ক্যানিং। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে ক্যানিং লোকাল নিয়ম করে ছাড়ে। এবার ক্যানিং থেকে চুনাখালি। সেখান থেকে নদীপথে ডুগডুগি বাজার। ওখান থেকে ভ্যানে মুখার্জির বাগান।
যখন গিয়ে পৌঁছবেন মোহিত হয়ে যাবেন গ্রামবাংলার রূপ-মাধুর্যে! সকাল সকাল পৌঁছলে দেখা যায় রাখাল গরু নিয়ে চরাতে চলেছেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

খেজুর রসে ভাঁড় নিয়ে চলেছেন। পারলে দু'এক গ্লাস পান করুন।

যদি পিকনিক হয় ২৫ ডিসেম্বর তাহলে মজে যাবেন মোরগ লড়াইয়ে। সুন্দরবনের খুব জনপ্রিয় লড়াই হয় মুখার্জির বাগান এলাকায়। সারা সুন্দরবনের মানুষ এসে জড়ো হন এই লড়াই দেখতে। ২০০-২৫০ বছরের পুরনো জমিদারবাড়ি ছিল। এখন ভেঙে মাঠ হয়ে গেছে। চারিদিকে গাছগাছালি।

বসতবাড়িতে এখন বিশাল বটবৃক্ষ ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে। ছায়া দিচ্ছে পথিকদের। জমিদারবাড়িতে ছিল দুহাজার নারিকেল গাছ। এখন বেঁচে আছে কয়েকটি। তবে শানবাঁধানো পুকুরঘাটটি পুরনো দিনের সাক্ষী দেয় এখনও। দুহাজার বিঘার ওপর ছিল মুখার্জি জমিদারবাড়ি। সুন্দরবনে এমন বিশাল পিকনিক স্পট নেই বলে জানান স্থানীয়রা। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠে শীতের সকাল কুয়াশামোড়া র‍্যাপার গায় যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন ভীষণই মোহময় লাগে মুখার্জির বাগান। ঝিলের ধারে গাছতলায় পিকনিকের জন্য আদর্শ। স্থানীয়দের কাছে জানা যায়, পিকনিকের জন্য টাকাপয়সা লাগে না। তবে একসঙ্গে প্রচুর লোকজন পিকনিকে গেলে সম্ভবত সামান্য অর্থ দিতে স্থানীয়দের অনুমতি লাগে। সেটা যাঁরা যেতে আগ্রহী এমন গ্রামবাংলার পটভূমিতে পিকনিক করতে তাঁদের একটা দল আগে গিয়ে কথা বলে আসুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন যাওয়ার ব্যাপারে।

৮। নিশ্চিন্তপুর

কলকাতার খুব কাছেই নিশ্চন্তপুর পয়লা নম্বর ঘাট। গঙ্গার ধারে আদিগন্ত খোলা মাঠ। আকাশ আর দিগন্ত মিলেমিশে গেছে। গঙ্গার সবুজ ঘাসজমি গালিচার মতো পরিপাটি করে পাতা। সেই গালিচা অতিথিদের জন্য বিছিয়ে রেখেছে প্রকৃতি! এত সুন্দর জায়গা খুবই কম আছে পিকনিকের জন্য। দেখবেন গঙ্গার বুকে জেলেডিঙি ভেসে যাচ্ছে। আবার একেবারে গঙ্গার ধারে ধীবরেরা জাল টাঙিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা করে রেখেছে। আবার মাছ ধরছেন আর জলের ওপর ভেসে থাকা হাঁড়িতে ধরা মাছ সযত্নে রাখছেন। আবার একহাঁটু কাদা ভেঙে স্থানীয় মানুষজন নৌকায় উঠছেন কোথাও যাওয়ার জন্য। কখনও সতর্ক হুইশেল বাজিয়ে বড় বড় জাহাজ চলেছে তার গন্তব্যে।

আপনি বা আপনারাও গন্তব্যে তো হাজির হয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই, তাই গঙ্গার পাড়ে সবুজ ঘাসে জায়গা নির্বাচন করে বসে পড়ুন পিকনিকে। নইলে জায়গা পাবেন না। না, টাকাপয়সা কিছু লাগবে না। তবে পিকনিকের পর জায়গাটি অবশ্যই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেবেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলপি যেখানে গঙ্গার পলি জমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এই জায়গাটি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বর্তমানে অনেকটাই বিস্তৃত। ফলে এখানে এক বিস্তীর্ণ তটভূমি তৈরি করেছে প্রকৃতি। শুধু পিকনিক করতে নয়, অনেকেই বেড়াতেও আসেন। প্রকৃতি এখানে সৌন্দর্যের ঝুড়ি উপুড় করে দিয়েছে! কোনওসময় বিরক্তি আসবে না মনে। শীতের সকালে গঙ্গার হিমেল বাতাস সূর্যের কিরণে কাটাকুটি খেলে। তবে আপনি বা আপনারা উপযুক্ত গরম জামাকাপড়ে আবৃত রাখবেন নিজেদের। প্রকৃতি তার কাটাকুটি খেলুক, আপনারা উপভোগ করুন পিকনিক।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদহ থেকে নামখানা লোকালে চেপে নামতে হবে নিশ্চিন্তপুর মার্কেট স্টেশন। স্টেশনের বাইরে থেকে টোটোতে চেপে পয়লা নম্বর ঘাট।

৯। সুশীলকুমার ঘোষ স্মৃতি উদ্যান

নাম দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। পিকনিকের নির্ভেজাল এক আদর্শ ঠিকানা। যাঁর নামে এই উদ্যান তাঁর পুত্র সুপ্রকাশ ঘোষ এটি দেখাশোনা

করেন। ১৫ বিঘা জমির ওপর বিশাল এই বাগান। সারা বাগানটি গাছগাছালি ভরা। বহু রকম গাছ। সেইসব গাছের ছায়ায় নিভৃতে বসে আপনমনে কাটিয়ে দিতে পারেন পিকনিক থেকে বেরিয়ে একা একা। কিংবা মনমতো বন্ধু কিংবা আপনজনকে নিয়ে বিশাল দিঘির ধারে দু'চারটে মনের কথা বলুন। যে-কথা বলতে পারছেন না সেই তাকে, বলে ফেলুন গাছতলায় বসে রোদ্দুর আর গাছের ছায়ার লুকোচুরি খেলার ফাঁকে। কিংবা ছোটবেলার রুমাল চোর খেলুন গাছের ছায়ায় কিংবা দিঘির ধারে। ভাল লাগবে। বুঝতে পারছেন পনেরো বিঘার বাগান, কম নয়!

এখানে দুটি পিকনিক স্পট, এক আর দুই। দুটি স্পটই বিশাল। হাঁপিয়ে যাবেন সারাদিন ঘুরতে। দুটি স্পটের কারওর সঙ্গে কারওর মুখোমুখি হওয়ার উপায় নেই। দুটো একেবারেই আলাদা, কোনও যোগাযোগ নেই এক দুইয়ে বা দুইয়ে একে। দুটি স্পটেই ভিন্ন দুটি ঘর, ওয়াশরুম ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন সব। আপনারাও পরিষ্কার রাখবেন।

যাঁরা বাচ্চা নিয়ে যাবেন তাঁদের কোনও চাপ নেই। ওদের খেলার বা ব্যস্ত রাখার প্রচুর কিছু মজুত বাগানে। শুধু নজরে বাচ্চারা দিঘির ধারে একলা না-যায়। বিপদ হতে পারে।

দুটি স্পটের ভাড়া দুরকম। প্রথমটির ভাড়া শনি, রবি, এবং ছুটির দিন ৮০০০ টাকা। অন্যান্য দিন ৭০০০ টাকা। দ্বিতীয়টির ভাড়া শনি, রবি এবং ছুটির দিন ৭০০০ টাকা। অন্যান্য দিন ৬০০০ টাকা। একেবারে বাচ্চাদের কোনও দল এলে ভাড়া একহাজার টাকা বাদ। দুটি স্পটেই সবরকম সুবিধাযুক্ত। ক্যাটারারের প্রয়োজন হলে বলবেন উনি ক্যাটারারকে বলে দেবেন।

কেউ বা কোনও পরিবার যদি থাকতে রাত্রিযাপন করতে চান বাগানে করতে পারেন। তার জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে। এসি, নন এসি সবরকমই আছে।

যোগাযোগ: ফোন- 6296964738/9734486388. (এই দুটিতে ফোন করার সময় সকাল আটটা থেকে দুপুর দেড়টা-দুটো, বিকেলে চারটে থেকে সাতটা)। 9434035474 (এটি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার)। এটিতে ফোন করা যাবে না বা ফোন করবেন না। হোয়াটসঅ্যাপ করবেন সুপ্রকাশবাবু সময় করে ফোন করে নেবেন। বুকিং ফোনেই হয়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভাড়ার অর্ধেক ফোনে বুকিংয়ের সময় দিতে হবে। বাকিটা পিকনিক করতে গিয়ে। সেসব বলে দেবেন উনি।

যাবেন কীভাবে: ট্রেনে হাওড়া-বর্ধমান কর্ডের ট্রেন ধরে গুড়াপ স্টেশন নামতে হবে। এরপর বাইরে এসে গুড়াপ-তারকেশ্বর লাইনের গাড়ি ধরে নামতে হবে মৌবেসিয়ার মোড় নেমে কমবেশি তিন মিনিট মতো। গাড়িতে দিল্লি রোড ধরে ভায়া ডানিকুনি হয়ে বাসিপুর মোড়। সবচেয়ে ভাল, যাঁরা যাবেন তাঁরা অবশ্যই সুপ্রকাশবাবুকে আগে ফোন করবেন।

১০। নন্দী বাগানবাড়ি

একেবারে নতুন করে সেজে উঠেছে এই বাগানবাড়ি। জায়গাটির নাম দেবপুকুর। নামটির সঙ্গে দেব-দেবীর সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে, তাই তো? না, খুব ভুল করছেন না। ঠাকুর-দেবতার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে দেবপুকুর। আড়াই কিমি দূরে 'সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির'। প্রায় পৌনে চারশো বছরের পুরনো এই মন্দির। লোকশ্রুতি রয়েছে,

ব্যারাকপুরের এক জমিদার ১৬৫১ সালে মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মূর্তি এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে ফি-বছর ধুমধাম করে অন্নকূট উৎসব এবং পুজো হয়। প্রচলিত আছে, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে আশপাশে আর কারওর বাড়িতে মায়ের মূর্তি এনে পুজো হয় না। সেই রীতি আচার নাকি এখনও চালু আছে ব্যারাকপুর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের আশপাশে।

কমবেশি পাঁচ কিমি দূরে নন্দলাল জিউয়ের মন্দির। 'নন্দদুলাল জিউ' অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধার যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মনে করা হয়, এই যুগলমূর্তি ষোলো শতকের প্রথমে প্রতিষ্ঠিত। দুটি মূর্তির নির্মাণ কৌশল ভিন্ন রাধিকা ধাতুর আর কৃষ্ণ কষ্টিপাথরের। আছে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের দারুমূর্তি।

কিংবদন্তি আছে, হুগলির শ্রীরামপুরের চাতরা নিবাসী, বৈষ্ণবচূড়ামণী শ্রীচৈতন্য পরিকর, পণ্ডিত কাশীশ্বর ছিলেন ভীষণরকমের গোঁড়া বৈষ্ণব। তিনি নিত্য নিজহাতে কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের পুজো করতেন। এমনকী, তিনি কোনও অবৈষ্ণবকে বিগ্রহ ছুঁতে দিতেন না। একদিন হয়েছিল কি, তিনি কোনও কাজে ছিলেন বাইরে। তাঁর দেরি দেখে তাঁর আত্মীয় রুদ্ররাম শ্রীকৃষ্ণের পুজো করেন। তিনি ছিলেন শাক্ত। কাশীশ্বর বাড়ি ফিরে শোনেন সবকিছু। এবং রুদ্ররামকে খুব বকাঝকা করেন। মনের দুঃখে রুদ্ররাম গৃহত্যাগ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় নেন এবং পুজো শুরু করেন। রুদ্ররামের সেবা আর ভক্তিতে তুষ্ট হন এবং স্বপ্নাদেশ দেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে বলেন, গৌড়ের রাজবাড়ি থেকে শিলা সংগ্রহ করে ওই স্থানেই তাঁর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে। রুদ্ররাম গৌড়ে যান এবং বাদশাহর এক হিন্দু উচ্চপদস্থ মন্ত্রীর কাছ থেকে শিলাখণ্ড সংগ্রহ করে পুজো শুরু করেন।

জানা যায়, পরবর্তী সময়ে বৃন্দাবনের এক শিল্পী ওই শিলাখণ্ড থেকে তিনটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ তৈরি করেছিলেন। তারই একটি ব্যারাকপুরের কাছে সাইবনার নন্দদুলালজিউ। এর পিছনে আরও অনেক কিংবদন্তি আছে।

বিশাল এলাকা নিয়ে নন্দী বাগানবাড়ি। রঙিন মরশুমি ফুলে ভরে ওঠে শীতের বাগান। প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে। বেশ ভাল লাগে নন্দী বাগানবাড়ি পিকনিক স্পট। আছে বড় একটি দিঘি। শীতের অলস দুপুর কেটে যাবে দিঘির ধারে বসে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গল্পগুজবে। কিংবা একা বা প্রিয়জন সঙ্গে বসে থাকুন দিঘির ধারে। পিকনিকের অবসরে যেতে পারেন কাছেই মঙ্গল পান্ডে উদ্যান, জওহর কুঞ্জ কিংবা গান্ধী ঘাটে। নয়তো পুরনো কালের নন্দদুলাল মন্দির আর সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের মন্দির।

ভাড়া শনি, রবি এবং ছুটির দিন ১২০০০টাকা, অন্যান্য দিন ১০০০০টাকা। শিয়ালদা থেকে মেন লাইনের ট্রেনে ব্যারাকপুর। তারপর বাইরে থেকে দেবপুকুর সাড়ে তিন কিমি। সড়কপথে বারাসত-ব্যারাকপুর রোড ধরে ন'কিমি। আশপাশে ঘোরাঘুরির জন্য বাগানবাড়ির কাউকে বললে অটো বা টোটোর ব্যবস্থা করে দেবেন। ভাড়া নিজেদের। যোগাযোগ: 98833 94992/99037 15123.

১১। গঙ্গাবিতান

জায়গাটির নাম শুনেই বোঝা গেল নিশ্চয়ই গঙ্গার ধারে। ঠিক তাই। একেবারেই নদীর ধারে। অপূর্ব জায়গা। পিকনিকের জন্য আদর্শ। গঙ্গার জলস্পর্শ উত্তুরে হিমেল বাতাস বয়ে যায় রোদ্দুরের সঙ্গী হয়ে। মনে হয়, অদৃশ্য কোনও কোমল হাতের ছোঁয়া সারা শরীরে! তবে সেই অদৃশ্য নরম হাতের স্পর্শে বুদ না-হওয়াটাই সমীচীন। পিকনিক করতে এসে ঝপ করে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তবে সবমিলিয়ে চমৎকার এক রোম্যান্টিক পরিবেশ তৈরি হয় মুহূর্তে! নদী মানেই তো রোম্যান্স। তবে এখানে পিকনিক করতে হলে কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে। না, তবে কোনও শাসনের বেড়াজাল নয়, শুধুই নিয়ম মেনে চলা। যা, জায়গাটি কোথায় তা তো বলা হল না! সকলেরই চেনা-পরিচিত জায়গা, গড়চুমুক, ৫৮ গেট। কাছেই গঙ্গাবিতান। একটি রুম নিতেই হবে। পিকনিক-সহ ঘরের জন্য ভাড়া পড়বে ৪০০০-৫৫০০টাকা। খাওয়াদাওয়া মাথাপিছু ১২০০টাকা। যোগাযোগ: 98300 11715.

১২। গড়চুমুক

এবার আসি গড়চুমুকের কথায়। এর অন্য আর এক পরিচিতি ৫৮ গেট। গঙ্গা-দামোদর নদীর সঙ্গমে পিকনিকের জন্য তো বটেই দু'এক দিনের ছুটি বা অবসরযাপনের আদর্শ। মনভুলানো এখানকার পরিবেশ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! পিকনিক কিংবা ছোট্ট ছুটি কাটানোর ফাঁকে নদীতে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়া যেতেই পারে কিন্তু অতি সাবধানে। কোনওরকম হইচই নয়, চুপচাপ দু'চোখ মেলে বুঁদ হয়ে থাকা উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে! এখানে আছে 'মৃগদাব', যার পরিচিতি 'মিনি জু'। নিত্য শীতে নরম রোদ্দুর মেখে পিকনিক করতে ভিড় করেন বহু মানুষ। বেড়াতেও আসেন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অনেকেই। ইউক্যালিপটাস, জারুল, শিশু, বাবলা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার ফাঁকে চুইয়ে পড়ে শীতের নরম রোদ্দুর আর ডেকে যায় বুলবুলি, বসন্তবৌরি, দোয়েল, টুনটুনি, মৌটুসি, বাঁশপাতি, ঘুঘু ইত্যাদি পাখি! সবমিলিয়ে গড়চুমুক ক্যায়া বাত!
হাওড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণ শাখার ট্রেনে উলুবেড়িয়া নেমে বাইরে থেকে অটোতে কমবেশি ১৫ কিমি। বাসও আছে। সড়কপথে গাড়িতে সময় নেবে সোয়া দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। গাদিয়াড়াতে নিশিযাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট লজ আছে।

১৩। গাদিয়াড়া

নদীর ধারে হাওড়ায় গাদিয়াড়া। আর ওপারে মেদিনীপুরের গেঁওখালি। নদীর দুই পারে দু'টি জায়গারই সৌন্দর্য সমান। অবশ্য নদীর ধারে যে-কোনও জায়গায় দারুণ লাগে, এ-কথা নতুন নয়। এখানে নদীর ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে মাঝির দাঁড় টানার ছপ ছপ মিলেমিশে অশরীরী শব্দ কানে বাজে! গঙ্গা, রূপনারায়ণ আর দামোদরের ত্রিবেণী বন্ধন বয়ে চলে তিন বন্ধুর মতো।
নদীর বুকে ভেসে যাওয়া যায়। তবে অতিসন্তর্পণে ভেসে থাকতে হবে। কোনও হইচই নয়, বেশি লাফালাফি নয়, কেবল শীতের রোদ্দুর সঙ্গী করে ভেসে যেতে হবে নদীসঙ্গ করে। তবেই প্রকৃতির রূপ-মাধুর্য উপভোগ করা যাবে। মাঝিভাইকে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি তিনটি আলাদা আলাদা করে চিনিয়ে দেবেন।
এখানে আছে লর্ড ক্লাইভের পুরনো দুর্গ। লাইট হাউস। নদীর ধারে বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি। যে-বাড়িতে বসে উনি আবিষ্কার করেছিলেন গাছেরও প্রাণ আছে। প্রকৃতি আর ইতিহাস হাত ধরাধরি করে চলে গাদিয়াড়ায়। এখানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট লজ। সবশেষে জানিয়ে রাখি, নদীর সৌন্দর্য, নৌকার ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ভেসে যাওয়া আর সূর্যাস্ত মোহিত করবেই আপনাকে। আর নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে মন খুলে নিজের সঙ্গে গল্প করুন

কিংবা মনের মানুষের সঙ্গে এই সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখুন, পাবেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অনুভূতি!
কীভাবে যাবেন: হাওড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণ শাখার ধরে বাগনান স্টেশন নেমে বাইরে থেকে অটোতে গাদিয়াড়া। বাসও আছে। সড়কপথে গাড়িতে ঘণ্টা তিন লাগবে।

১৪। নীলদীপ গার্ডেন

দূরত্ব কলকাতা থেকে মাত্র ৩০ কিমি দূরে অপূর্ব একটি জায়গা। রংবেরঙের মরশুমি ফুল আর সবুজের মাঝে ভাল লাগবে শীত-দুপুরের রোদ্দুরে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বসে থাকতে। বড় মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে শীতের দুপুর! তারই মাঝে পাখির কলগুঞ্জন আরও বেশি মোহময় করে তোলে! সকলের সঙ্গে পিকনিকে এসে সময় কেটে যাবে ঘড়ির কাঁটাকে পরাস্ত করে! বাচ্চাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। বাচ্চারা তাদের মতো সময় কাটাতে পারে।

আগে থেকে বলে রাখলে প্রাতরাশ থেকে লাঞ্চ এবং বিকেলের স্ন্যাকস-- সবেরই ব্যবস্থা করে রাখবে এখানে। নিজেরাও ব্যবস্থা করে নিতে পারেন।

যাবেন কীভাবে: শিয়ালদা থেকে দক্ষিণ শাখার ট্রেনে বারুইপুর। বাইরে থেকে অটোতে জোগাইলপুকুর মোড়। কাছেই নীলদীপ গার্ডেন। সড়কপথে বাইপাস ধরে বারুইপুরের শেষে ডানহাতে আমতলার রাস্তা, সেখান থেকে জোগাইলপুকুর মোড়। ল্যান্ডমার্ক হল আই হসপিটাল। ভাড়া শনি, রবি এবং ছুটির দিন ১৫০০০টাকা, অন্যান্য দিন ১০০০০টাকা। যোগাযোগ: 98303 81827/96744 77044 (এই নাম্বারে বুকিং করা যায়)। Website: www.neeldeepgarden.com

১৫। নহবত

নহবতের সঙ্গে বিয়েবাড়ির একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু না, এ কোনও বিয়েবাড়ি নয়, পিকনিক বাড়ি। ছোট্ট কিন্তু চমৎকার। গাছগাছালি আর রঙিন ফুলের সমাহার। নহবত বাগানবাড়িতে আছে

ওয়াশরুম-সহ বিশ্রামঘর সঙ্গে খাবারঘর। এখানকার লৌকিক দেবতা বাবা পঞ্চানন্দ মন্দির। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস বাবা পঞ্চানন্দ খু জাগ্রত। ঘুরে আসতে পারেন। আছে মা বিপত্তারিণীর মন্দির। ইনিও ভীষণ জাগ্রত দেবী। পিকনিকের অবসরে ঘুরে এলে খারাপ লাগবে না।

শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেনে সোনারপুর নেমে অটোতে বোসপুকুর মোড়। পাশেই নহবত বাগানবাড়ি। সড়কপথে গাড়িতে রাজপুর হয়ে আসতে হবে। মাত্র এক কিমি নহবত পিকনিক গার্ডেন। ৪০+ জনের মধ্যে দলকে ধরে রাখতে হবে। ভাড়া:৫০০০টাকা+ যোগাযোগ: 98307 81988.

১৬। রায়চক

রায়চক গঙ্গা পাড়ের এই অঞ্চলটি বরাবরই ভীষণই আকর্ষণীয়। কলকাতার কাছেই এই রায়চক। ডায়মন্ড হারবারের এই এলাকাটি কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র ৫০-৫৫ কিমি। হুগলি বা গঙ্গার তীরবর্তী রায়চকের অপরূপ প্রাকৃতিক রূপমাধুরী মনে অদ্ভুত এক প্রশান্তি এনে দেয়! রায়চকের আকর্ষণ হল ফোর্ট। ইংরেজ শাসনকালে এটি তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। ফোর্টের ওয়াচ টাওয়ার থেকে নদীর মনকাড়া সব দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কাছেই ডায়মন্ড হারবার লাইট হাউস, চিংড়িকালী ফোর্ট। যদিও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে চিংড়িকালী ফোর্টটি এখন কেবলমাত্র ধ্বংসস্তূপ।
শীতের রোদ্দুর আর গঙ্গার হিমেল হাওয়ায় গা-ভাসিয়ে রায়চকে নদীর ধারে একটি জায়গা বেছে নিয়ে বস পড়ুন। পিকনিক জমে যাবে। যাঁরা অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসেন তাঁরা এখানকার জেটি থেকে ভুটভুটি বা লঞ্চে নদীর অপর পারে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে একবার ঢুঁ মেরে আসতে পারেন। জলপথে যাওয়া যায় হাওড়ার গাদিয়াড়ায়। ইচ্ছা হলে গঙ্গার বুকে নৌকা নিয়ে ঘুরতেও পারেন। অন্যরকম ভালোলাগা অনুভব করবেন। হাতে সময় থাকলে পাশেই নুরপুর, ঘুরে আসতে পারেন। নদীর ধারে ওই জায়গাটিও পর্যটকদের মন ভরিয়ে দেবে।

১৭। বসিরহাট ইছামতী পার্ক

এই পার্কটির একটি পোশাকি নাম থাকলেও পরিচিতি 'ইছামতী পার্ক' হিসেবেই। বিশাল এলাকা। তাই ভিড় গায়ে লাগে না। চারিদিকে কেবলই সবুজ। দূর থেকে মনে হয়, কেউ যেন সবুজ গালিচা পেতে রেখেছে অতিথিদের বরণ করার জন্য। জায়গাটি এককথায় চমৎকার! বিশাল এক জলাশয় রয়েছে, যেখানে বোটিং করা যায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে। এই ফাঁকে বলে রাখি, পার্কে ঢুকতেও দশ টাকা লাগে মাথাপিছু। তবে পিকনিকের জন্য কোনও অর্থ দিতে হয় না। পার্কে প্রবেশের পথটি ভারী সুন্দর আর চোখের আরাম। শহরের দূষণ থেকে বেরিয়ে টাটকা অক্সিজেন পরিবেশন করার জন্য তৈরি বসিরহাট ইছামতী পার্ক।

১৮। ইকো ফ্রেশ এয়ার পার্ক

নিরালা নিরিবিলি প্রকৃতির আলাপ জমাতে হলে তুলনাহীন ইকো ফ্রেশ এয়ার পার্ক। সাজানো-গোছানো বিশাল এলাকা রকমারি ফুলগাছে ভর্তি। শুধু ফুল কেন, প্রায় সমস্তরকম ফল গাছ আছে। এমনকী, আপেল গাছও। আছে বিশাল এক জলাশয়, এখানে বোটিং করা যায়। বাঁধানো দিঘির ধারে শীতের রোদ্দুর পিঠে নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিতে ভাল লাগবে। বাচ্চাদের নিজেদের মতো সময় কাটাতে পারে, কোনও সমস্যা নেই। বাচ্চাদের খেলার সবকিছু রয়েছে পার্কে।
ভাড়া: শনি, রবি আর ছুটির দিন ১৮০০০টাকা। অন্যান্য দিন ১২০০০টাকা। দেওয়া হবে ওয়াশরুম-সহ একটি ঘর। ৫০জন বসে খেতে পারেন এমন একটি বাঙ্কোয়েট হল আছে। সঙ্গে বাসনপত্র না-আনলে কোনও অসুবিধা নেই। সব পাওয়া যাবে এখানে। আগে বলে রাখলে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করে দেবেন পার্ক কর্তৃপক্ষ। তার আলাদা টাকা লাগবে।

কীভাবে যাবেন: সড়কপথে রুবির মোড় থেকে কমবেশি ১২ কিমি। রুবির পাশ দিয়ে ঢুকে খেয়াদহ স্কুল ডানদিকে রেখে চার কিমি মতো এগোলেই তিহুরিয়া নয়াবাদে এই ইকো ফ্রেশ এয়ার পার্ক। ট্রেন: শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেনে সোনারপুর স্টেশন নেমে বাইরে এসে নয়াবাদের দিকে কমবেশি চার কিমি গেলেই এই পিকনিক স্পট। যোগাযোগ: 98306 11286.

১৯। প্রত্যুষা পার্ক

পশ্চিম মেদিনীপুরে কেশিয়ারিতে এই প্রত্যুষা পার্ক। ৫০ একর জমির ওপর এই পার্কটি গড়ে উঠেছে। বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন পার্ক কতৃপক্ষ। স্লিপ, দোলনা থেকে সবকিছুই আছে। পার্কের ভিতর এক বিশাল জলাশয়। সেখানে ঘাটে বাঁধা রয়েছে বোট। চমৎকার দেখতে বোটগুলো। রাজহাঁসের মতো আকার। সেই বোটে চেপে ভেসে পড়ুন জলাশয়ে। পিকনিক করতে গিয়ে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে। মজাও হবে।

শীত মানেই তো বেড়ানোর আমেজ, পিকনিকের মজা। তা এবারের পিকনিক হতেই পারে মনকাড়া পরিবেশে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির প্রত্যুষা পার্ক। কেশিয়াড়ি জীব বৈচিত্র্য ও শিশু বিনোদন উদ্যান 'প্রত্যুষা'। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আচ্ছন্ন করে। বাচ্চারা নিজের মতো সময় কাটাতে পারে। আছে বাচ্চাদের খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম। পার্কের ভেতর কৃত্রিম হাতি, হরিণ। খুব সুন্দর পার্কের বড় রঙিন ফোয়ারাটি। মানুষের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় রাজহাঁস, টার্কি, পায়রা। জলাশয়ে ফুটে থাকে পদ্ম।। বিশাল এলাকা তাই ঘুরতে সময় লাগে। শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে ঘুরতে ভালই লাগব। পিকনিকের জন্য চমৎকার জায়গা। এবারের শীতে অতিথিদের জন্য সেজে উঠেছে প্রত্যুষা পার্ক। সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিনোদন পাবেন। যাকে বলে ষোলো আনা আনন্দ। যাতায়াতে কোনও অসুবিধা নেই। খড়্গপুর থেকে ঘণ্টাখানেক।

২০। পুষ্পবন

নামটি শুনলেই কেমন একটা রূপ-মাধুর্যের ছবি ফুটে ওঠে! চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফুলে ফুলে রঙে রঙে সাজানো চমৎকার এক বাগিচা! মনে হয় যেন, এই বাগিচায় স্বর্গের পারিজাত ফুলও মিলবে! স্বর্গের পারিজাত না-পেলেও 'পুষ্পবন' সত্যিই মরশুমি ফুলে ভরা রঙিন এক চমৎকার পিকনিক স্পট! বাঙালির পিকনিকের জনপ্রিয় জায়গাগুলোর একটি ডায়মন্ড হারবার। গঙ্গার ধারে। কাছেই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পুষ্পবন। আর পুষ্পবন থেকে পিকনিকের অবসরে কেউ যদি গঙ্গার ধারে যেতে চান, তাহলে বলে রাখি মাত্র মিনিট পাঁচেক গঙ্গা। দেখবেন শীতের উত্তুরে হিম-বাতাস বিলি কেটে দিচ্ছে গঙ্গার জল। অদ্ভুত এক ছবি তৈরি হয় গঙ্গার জলে!

পুষ্পবনের কিছুটা দূরে দু'টি কেল্লার ভগ্নস্তূপ। সেকালে একটি ছিল পর্তুগিজদের, অন্যটি ইংরেজদের। পিকনিকের অবসরে কিছুক্ষণ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকতে মন্দ লাগবে না। পুষ্পবনে বুকিং করে আসাই শ্রেয়। কেননা, শীতে চাপ থাকে। এখানে আছে দু'টি পিকনিক স্পট। একটির ভাড়া ৫০০০টাকা, অন্যটির ৪০০০টাকা। ওয়াশরুম-সহ একটি ঘর পাওয়া যায়। এবং টিভি লাগানো। যোগাযোগ: 98310 39032.

কীভাবে যাবেন: ট্রেনে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেনে ডায়মন্ড হারবার নেমে বাইরে থেকে টোটোতে পুষ্পবন। ভাড়া- ১০ টাকা। ল্যান্ডমার্ক 'মহুয়া' হোটেল, ঠিক বিপরীতেই পুষ্পবন। সড়কপথে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে গিয়ে ৭৬ নম্বর বাসস্ট্যান্ড। বাস না-থাকলেও, লোকমুখে ৭৬ নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে গেছে।

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

অমলকান্ত শোভা নিয়ে মুরগুমা দরিয়ার হাতছানি ...

ফাগুন বাতাসের ফিসফিসানির সঙ্গে লেপটে রয়েছে নীল দিগন্ত, সিঁদুররঙা পলাশ-কুসুম। অচেনা পাখিদের কলধ্বনি। পাখিরা ঠোঁটে করে ফাগুন বয়ে আনে। শিস্ দেয় মনোহর ধুনে। গাছে গাছে, ডালে ডালে। বসন্ত ঝাঁপিয়ে আসে গানে গানে – 'আহা আজি এ বসন্তে'। অমলকান্ত শোভায় ফাগুন বাতাস উড়ছে। রাঢ়বাংলার রাঙামাটি, শুখা পাহাড়ের গায়ে সবুজ দেখতে দেখতে ঢুকে পড়েছি শাল-পিয়াল-অমলতাস-কুসুম-পলাশ বনপথ চেরা এলাকায়। আঁকাবাঁকা পথের প্রতিটি বাঁকেই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চূড়ান্ত একেকটি দৃশ্যের বদল। সারাদিনমান গাছের পাতায় আলোছায়ার চু কিত্ কিত্। রাঢ়ভূম সেজেছে ফুলপাতার বাহারে। গাছেরা ভাঁজ করে পাতা। ভ্রাম্যমনের পড়শিরা এইসবই দেখে আনমনে। চমকে দিয়েই পাহাড়কোলের মনোরম জলাশয়টির সঙ্গে চোখাচোখি হল। সাহারজোর নদী ঘিরে সুন্দর এক জলাধার। সাহারজোর নদী ঘিরে বাঁধ, আর সেই বাঁধের ধারে পাহাড়ের মধ্যিখানে পুরুলিয়ার ছোট্ট এক আদিবাসী অধ্যুষিত নিঝুম পাড়াগাঁ মুরগুমা। জলাশয় ঘিরে ছোট ছোট টাঁড়। নির্মল জলাশয়ের জলে বিম্বিত হয় তাদের স্থিরচিত্র।

অযোধ্যা পাহাড়ের উত্তরপশ্চিমের শেষদিক, যা ছোটনাগপুর মালভূমির আবার পুবদিকও বা বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমানায়, ঝালদা ব্লকে অবস্থিত মুরগুমা মূলত সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম। এখানকার জনজাতির আর্থিক ব্যবস্থা কৃষিকাজ নির্ভর। ইদানীং এই অঞ্চলে পর্যটক সমাগম কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় হোমস্টের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হচ্ছে কিছুটা। প্রায় প্রতিটি গৃহস্থের নিকানো উঠোনে গরু, মোষ, ছাগল, মুরগিদের গৃহপালিত বসত। খোঁটায় বাঁধা গরু আপনমনে জাবর কাটছে। গলায় ঘণ্টি বাঁধা ছাগলগুলো এলোমেলো চরে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত ছাগশিশুদের তিড়িংবিড়িং। মুরগি তার ছানাপোনাদের নিয়ে নিকানো মাটির দাওয়ায় নিশ্চিন্তে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে দানা। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িগুলির দেওয়ালে কী সুন্দর করে আলপনা আঁকা। অপূর্ব দৃশ্যশৈলী! নিষ্পাপ শিশুগুলি লাজুক মুখে চেয়ে থাকে। এক্কেবারেই সহজ সরল আদিবাসী যাপনচিত্র। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুবিধার্থে আগের তুলনায় এখন এই অঞ্চলের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। দূর পাহাড়ের টাঁড়ে ছোটনাগপুর মালভূমির ঢেউ খেলানো আঁকিবুঁকি।

বসন্তের দোলপূর্ণিমার ছুটিটাকে কাজে লাগিয়ে আগেপিছু আরও দিন দুয়েক জুড়ে নিয়ে পুরুলিয়া এসেছি। প্রথম গন্তব্য মরগুমা। কলকাতা থেকে বেশ ভোরেই বেরিয়েছি। কলকাতা থেকে মুরগুমার সড়কপথ দূরত্ব ৩২৭.২ কিলোমিটার। আমাদের ভাড়াগাড়ির সারথি বিকাশদা আবার জাতীয়সড়ক ১৪ পরবর্তী যাত্রাপথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় তেমন। ওঁর জন্য এবার স্মার্ট ফোনের জিপিএস খুলে রাখতে হল। মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠছে পথনির্দেশ সংক্রান্ত সূচনা। যাবার পথটাই এত চমৎকার। মরগুমা যাওয়ার পথে বেগুনকোদর নামের স্টেশনটাও এবার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দেখে নিলাম। বহু গালগল্প রয়েছে এই স্টেশন নিয়ে। লোককাহিনি যে এই স্টেশনে নাকি ভূত আছে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীও বর্ননা দিতে পারেন অশরীরী অস্তিত্বের। তবে পরিত্যক্ত স্টেশনটি হালে ভূতের ভয় কাটিয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। পাহাড়-সমুদ্র-জঙ্গল-লোকালয় এদের প্রত্যেকেরই আলাদা গল্প থাকে। আর সবকিছুর বাইরেও থাকে কিছু মুহূর্তকথা। মনে হয় এই তো প্রকৃতির বুকে এলাম। দু'একটি আদিবাসী পাহাড়ি গ্রাম পেরিয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে পথটি। পাহাড় থেকে নামার আগেই যে বাঁকটা এল, সেটা ঘুরেই সামান্য নীচে নয়নাভিরাম মুরগুমা বাঁধ ও জলাধার। দুর্দান্ত, টুকে রাখার মতো দৃশ্য। মুরগুমা প্রথম দর্শনেই মন জুড়িয়ে দিল। কী মিষ্টি জায়গাটা। এখানেই একটা রাতদিন থাকব ভেবে বেশ উৎফুল্ল লাগছিল মন। বাঁধটার পাশ কাটিয়ে পৌঁছে গেলাম আগে থেকে বন্দোবস্ত করে রাখা পলাশবিতান জঙ্গলহাট।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে ছোট্ট করে বিছানায় গড়াগড়ি বাকি ছিল। খুব ভোরে রওনা হয়েছিলাম। সামান্য বিশ্রাম জরুরি ছিল সেটা বিছানায় শরীর মেলে দিতেই টের পেলাম। মধ্যাহ্ন যেভাবে অপরাহ্ণ হয়ে উঠছে, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ি বাঁধের পাড়ে যাওয়ার জন্য। বাঁধের ওপর দিয়ে মসৃণ পথটা ভারী সুন্দর। পথের একদিকে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত বিস্তৃত মরগুমা জলাধার, অন্যদিকে ইতস্তত গ্রামের ঘরদুয়ার। সেখানে শুধুই গ্রাম্যজীবন। পাহাড়ের বিকেলের আলোয় মায়াবী লাগছে। বাঁধানো পিচের রাস্তা ধরে মিনিট দুয়েক হেঁটেই সামনের পাহাড়ের নীচে পৌঁছে একটু এগিয়েই জলাধারের লাবণ্যরূপ। বাঁদিকে পাহাড়টার শিরে একটা মন্দির। বাঁধের নীচে নেমে যাওয়ার পথ মরগুমা গ্রামের ভেতর হারিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সূর্যিমামার পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। জলাধারের জলে তারই প্রতিফলন। এদিকে আবার পূব আকাশে প্রাক দোলপূর্ণিমার গোল চাঁদটাও দেখা দিতে শুরু করেছে। চারপাশের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে অস্তাচলে যাওয়ার আগের শেষ রোশনি প্রতিফলিত হয়ে এই স্থানটিকে অদ্ভুত বর্ণময় করে তুলেছে। ওই ওপারের দূরের পাহাড়টাই অযোধ্যা পাহাড়। পাহাড়ের পিছনে আলোর ছটা মাখিয়ে সূর্য ডুবকি লাগালেন। জলের পাড়ে ক্রমে বিকেলটুকু শেষ হয়ে আসে। হ্রদের গর্ভ থেকে উঠে আসা ক্ষণিক মায়া— ভালোবাসা বিলিয়ে দিতে চায়।

সন্ধে নামার আগেই, দিনান্তের আলোটুকু সম্বল করে ফিরে আসি আস্তানায়। ফিরতিপথে দেখছিলাম গ্রামের মানুষজনও যে যার নিজস্ব কাজের শেষে বাড়ির পথে। একপাল গরুদের মুখে বিচিত্র শব্দ করে, একা হাতে সামলে, নিয়ে ফিরে চলেছেন আদিবাসী পুরুষটি। মাথায় গাছের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ডালপালা, পাতা, কাঠকুটোর বোঝা নিয়ে গ্রামীণ মেয়ে-বউ। ওই কাঠকুটোই ওদের রান্নার উনুনের ইন্ধন জোগাবে। রান্না বসবে। অবাধ্য ছাগশিশুদের হাতের কঞ্চি দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে গোঠে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছেন ন্যুজ প্রবীণা আদিবাসী রমণী। এইসবই রুখুশুখু পুরুলিয়ার গাঁয়ের অতি পরিচিত সাবেক দৃশ্য। এখানকার সম্বন্ধে জেনে নিচ্ছিলাম স্থানীয়দের সঙ্গে কথালাপে। আমাদের জন্য সন্ধের চা, মুড়িমাখা ও টুকিটাকি নিয়ে এলেন কটেজের দায়িত্বে থাকা কর্মীভাইটি। জানিয়ে গেল, একটুপরেই শুরু বসবে ছৌনাচের আসর। চাঁদ তখন প্রায় মাথার ওপর। প্রাক-জ্যোৎস্নার আলোকে আলোকিত মুরগুমা। সন্ধের মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে বাইরের খোলা প্রান্তরে বেশ ঠান্ডার শিরশিরানি অনুভূত হচ্ছিল। কটেজে এসে সিঁধোই। রাতের খাওয়া সেরে শাল জড়িয়ে, রিসর্টের মধ্যেই একটু পায়চারি করি। মরগুমা শান্ত নিরিবিলি এখন। আলো-আধাঁরির মায়াজাল ঘনিয়ে রেখেছে পরিবেশে।

মুরগুমা মূলত জলাধার। কংসাবতী নদীর শাখানদী সাহারাজোর নদীর বয়ে আসা জল নিয়েই ১৯৬৫ সালে জলাধারটির উৎপত্তি। এই ড্যামটি সাহারাজোর ইরিগেশন স্কিমের অধীন। অযোধ্যা পাহাড় থেকে চুঁইয়ে নামা অন্যান্য নদী, ঝোরার জলধারাও সরাসরি এসে মিশেছে এই জলাশয়ে। আবার একবার নতুন করে ভালো লাগায় জাপটে ধরতে চাইলো মরগুমার সকাল। এখানে নাকি সূর্যোদয়দৃশ্যও জব্বর। কিন্তু ভোরে একরাশ আলস্যিতে আর ওমুখো হইনি। এখন যখন এলাম, সূর্য অনেকটাই উঠে গেছে। নরম আলো মেখে মরগুমা। যদিও পর্যটক তুলনামূলকভাবে কিছু কম। স্থানীয়রাই আসেন চড়ুইভাতি করতে। জঙ্গলময় সবুজ পাহাড়টিলা ঘেরা বিশাল টলটলে নীল জলরাশি। বাঁধের ওপর লাল মাটির রাস্তা। জলাশয়ে ছোট ছোট দ্বীপের মতো ভুখণ্ড মাথা উঁচু করে উজিয়ে রয়েছে। সেখানেও সবুজের ঘন প্রলেপ। একদিকে সাহারাজোর ও অন্যদিকে মুরগুমা জলাশয়। পুরুলিয়ার সব জলাশয়গুলি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এরই মাঝে অযোধ্যা পাহাড়ের বাঁকে জঙ্গলের আধারে লুকিয়ে থাকা উকামবুরু নামের পাহাড়টিলা। আশ্চর্য সুন্দরের ঠেক। একটা বুনো জলজ গন্ধ ছেয়ে রয়েছে চারদিকে। ডিঙিনৌকায়

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

স্থানীয় মানুষজন মাছ ধরছেন। নিবিড় নিসর্গ আস্বাদের মোহে মরগুমা জলাশয়ের ধারে বসে সময় কাটাই অনেকক্ষণ।

প্রাতরাশ সেরে গাড়ি ঘোরাই পুরুলিয়া শহরের শহরের দিকে। বাকি দুইদিন ওখানেই রাত্রিবাস ও কাছেপিঠে অন্যান্য জায়গাগুলি ঘুরে দেখা। মুরুগুমা গ্রামকে ছেড়ে হাত নাড়ছি আমি। গাড়ির জানলার কাচ নামিয়ে কুসুম-পলাশ গাছে ফুলের লালিমা লাগা দেখছিলাম। বসন্তের সোনা রোদে ফড়িং ওড়া পথ। দু'হাত ছড়ানো আকাশ। পথের ভূমিতে উড়ে যাওয়া ঝরা পাতা। এমত অবস্থায় ফাগের রৌণক মাখতে মাখতে সোহাগ জানাচ্ছে ফুলকে, ফুল সোহাগ জানাচ্ছে পাতাকে, সোহাগী হয়ে পড়ছি তো আমরাই। এও এক অমোঘ আলসেমি। এই যেমন পুরুলিয়ার চরাচরের পেছনে ছুটে বেড়ানো। এখন মধুমাস। নিকটবর্তী বাকি পথটুকুও বেশ স্নিগ্ধ। পথের দু'পাশে পলাশ গাছের সারি ঝেঁপে রয়েছে। দখিনা বাতাসে তার পাতায় পাতায় দোলা। আমার স্মার্টফোনের ক্যামেরা খুঁজে নিচ্ছিল পারিপার্শিক প্রকৃতিকে। কলকাতার খুপরি ফ্ল্যাটের জানলা বা ব্যালকনি থেকে তো এই দুর্লভ দৃশ্যপট দেখা যায় না।

ফাগুনের ফিচেল হাওয়ায় ঝরা পাতাদের গান ছাপিয়ে মনে এখন তীব্র হয়ে উঠেছে হুল্লোড়পনা। দরাজ মেজাজে গাইছিলাম, 'পিন্ডারে পলাশের বন পলাব পলাব মন / নেংটি ইঁদুরে ধান কাটে / ও কাটে রে / গতরে পিরিতি ফুল ফোটে"

কীভাবে যাবেন:

হাওড়া ও সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে সরাসরি পুরুলিয়া যাচ্ছে রূপসী বাংলা, লালমাটি এক্সপ্রেস, হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়াও রয়েছে আরও কিছু রাতের ট্রেন। পুরুলিয়া থেকে গাড়িতে ৪৫ কিলোমিটার দূরে মরগুমা চলে আসা যায়। সময় লাগে ঘণ্টাখানেক। সড়কপথে কলকাতা থেকে মুরগুমার দূরত্ব ৩২৭.২ কিলোমিটার। সময় লাগে কমবেশি ৭ ঘণ্টা মতো।

কোথায় থাকবেন:

থাকার জন্য রয়েছে পলাশবিতান জঙ্গলহাট, বনপলাশী ইকো হাট, মুরুগুমা ইকো হাট ইত্যাদি। অতিথিরা চাইলে ছৌ নাচেরও আয়োজন করা হয়।

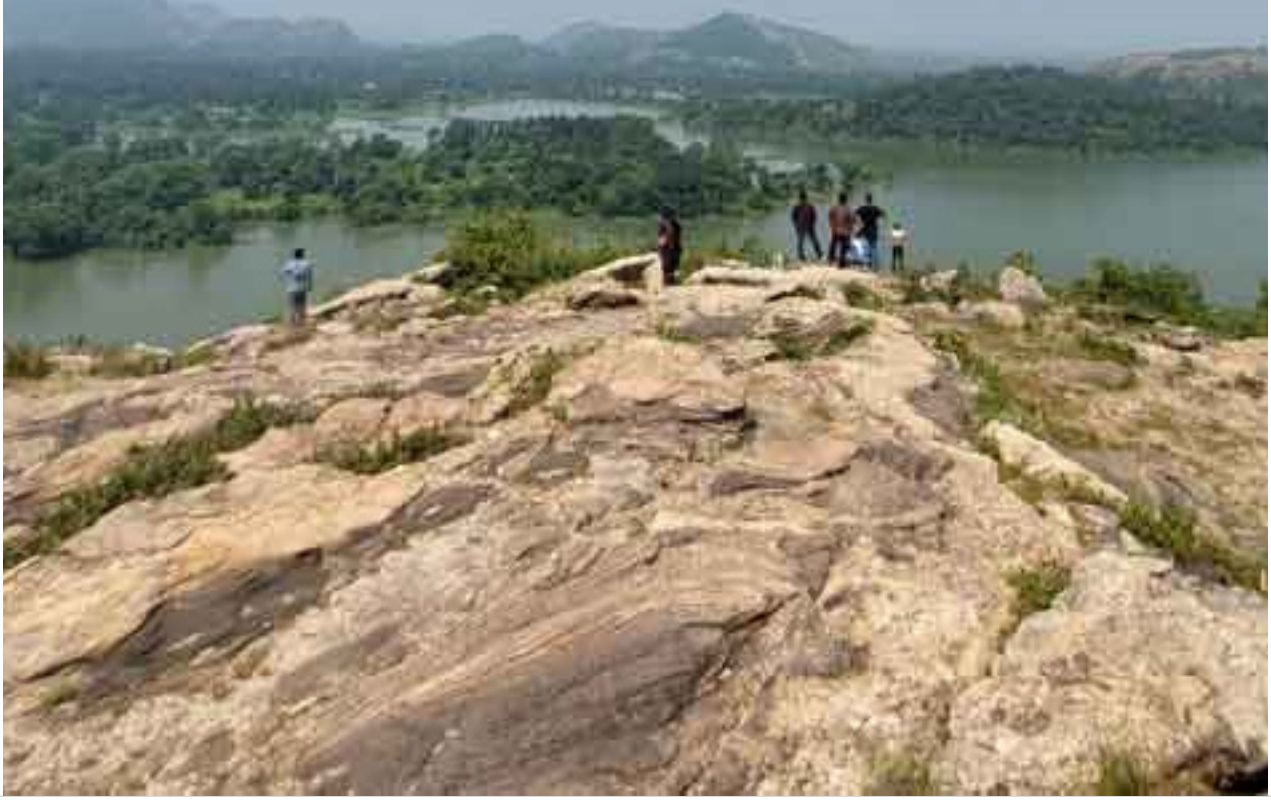

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

এলিজা

বিয়ের সাজে বৈচিত্র অনেক

শীত মানেই খাওয়াদাওয়া আর বেড়াতে যাওয়া, আর খাওয়াদাওয়া মানেই বিয়েবাড়ি, তবে বিয়েবাড়ির মানে শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, সঙ্গে অবশ্যই সাজগোজ। এইবারে শীতে বিয়ে বাড়ির সাজে কী কী ধরনের স্টাইল করা যেতে পারে সেই নিয়ে কিছু আইডিয়া রইল

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

এবার বিয়ের বর-কনের বা বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতদের সাজপোশাকে বড় জায়গা নেবে সাসটেইনেবল ফ্যাশন। এছাড়া থাকবে প্রচুর পরিমাণ প্যাস্টেল শেডের পোশাক, মেটালিক কালার হাইলাইট, বেরি কালার,প্রমিনেন্ট কালার, হাইটকনট্রাস্ট, একই কালারের বিভিন্ন শেড, লাইট ওয়েট ফেব্রিক, আনইজুয়াল কাট, মিউটেড কালার্স, বোল্ড পার্টি লুক ইত্যাদি ইত্যাদি।

লক্ষ করলে দেখা যাবে আজকাল সবাই নিজের বিয়েতে এমনকিছু একটা করতে পছন্দ করেন যেটা কিনা সকলের থেকে আলাদা। ফলত, যেমন সাসটেইনেবল ফ্যাশন এবার বিয়ের অন্যতম অংশ ঠিক তেমনি আমরা ওভার ড্রামাটিক পোশাক দেখতে পাব এবার বিয়ের সিজনে, কিছু বিয়েতে যেমন নির্দিষ্ট থিম থাকবে পোশাকের জন্য, অন্য ক্ষেত্রে বিয়েতে কোন থিম না থাকলেও সাজ লার্জার দ্যান লাইফ হবে। তবে মজার কথা এই যে, আজকাল শুধু মেয়েদের পোশাকেই যে অনেক ভ্যারাইটি থাকে তা নয়, ছেলেদের পোশাকেও রয়েছে প্রচুর রকমফের। বিশেষত, শীতকালে বিয়েবাড়িতে ছেলেদের পরার জন্য যেমন রয়েছে স্যুট, শেরওয়ানি, ধুতি-পাঞ্জাবি, শাল বা চাদর, ঠিক তেমনই জায়গা করে নিয়েছে প্রিন্সেস কোট, টাক্সেডো, বন্ধ গলা, জহর জ্যাকেট, আংরাখা, বেনিয়ান জাতীয় পোশাক। তবে এইবার পুরুষদের পোশাকে কিছু মর্ডান কাট-এর ট্রাডিশনাল পোশাকও চোখে পড়বে।

বিয়েবাড়ি সে শহরের মধ্যেই হোক কিংবা শহরের বাইরে, আজকাল সবকিছুতেই সাসটেইনেবিলিটি একটা বড় রোল প্লে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

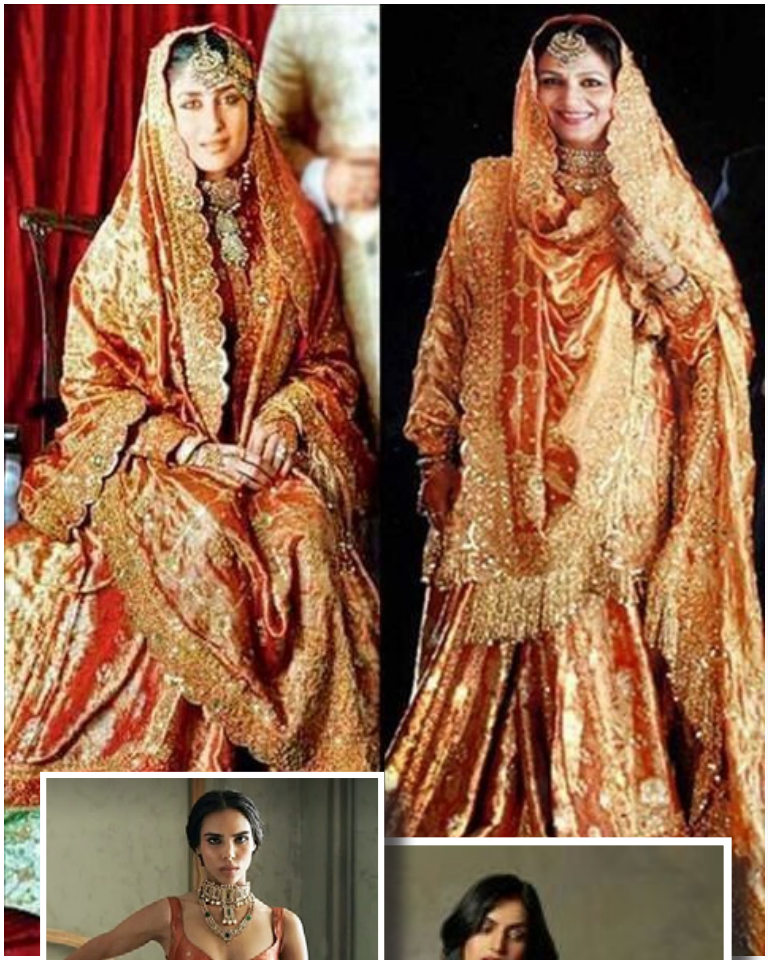

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

করে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের পোশাক যেটা কিনা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে পরা যায় তেমন পোশাক নজর কাড়বে।

সাসটেইনেবল থিম

আজকাল সব জায়গাতেই সাসটেইনেবলিটির বহুল প্রয়োগ আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিজেদের লাইফ স্টাইলের সমস্ত ক্ষেত্রে, ঘর সাজানো হোক, পোশাকআসাক হোক কিংবা ব্যবহারিক জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে সকল সচেতন মানুষ সাসটেইনেবল লাইফ স্টাইলের দিকে ঝুঁকছেন। বিয়ের অনুষ্ঠানও তাই, সাসটেইনেবিলিটি এড়িয়ে করা সম্ভবই নয়। তা সে বিয়ে বাড়ি সাজানোই হোক কিংবা বিয়ে বাড়ির পোশাক। কনে হয়তো নিজের মায়ের বা ঠাকুরমার বিয়ের পোশাকে সাজবেন নিজের বিয়েতে, বরও পরে নিতে পারবেন নিজের বাবা কিংবা ঠাকুরদা অথবা ফ্যামিলির কারওর ধুতি। তবে শুধু বর-কনেই নয়, বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতরাও পুরনো শাড়ি ধুতি বা অন্যান্য পোশাক মিক্স ম্যাচ করে বা রি-ডিজাইন করে পরতে পারেন। এসব কিছু ছাড়াও নতুন পোশাকও এমনভাবে বানানো হবে যা রি-ইউজ, রি-পারপাসিং বা মিক্স ম্যাচ করে পরবর্তী কালে পরা সম্ভব হয়। আজকাল অনেকেই ডেস্টিনেশন ম্যারেজ করে থাকে, সে ক্ষেত্রে এরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

সাস্টেইনেবেল ফ্যাশনের মূল মন্ত্র যেহেতু একই জিনিস একাধিকবার ব্যবহার করা কিংবা পুরনো জিনিসকে রিপারপাসিং করা, সেক্ষেত্রে মিক্স ম্যাচ করে দু'একটা জিনিস বিয়ের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একাধিকবার ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে লাগেজও কম বইতে হবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

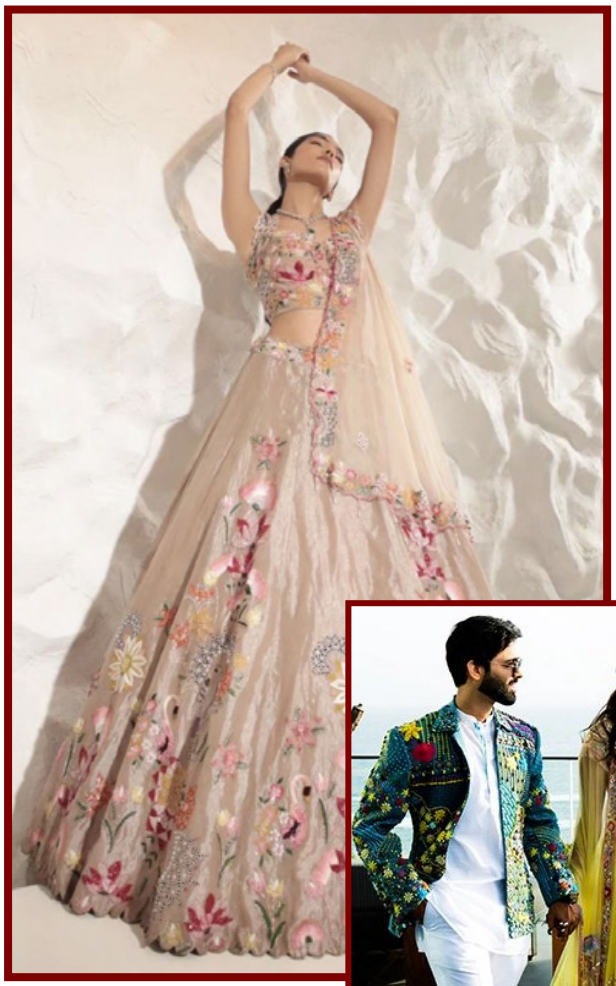

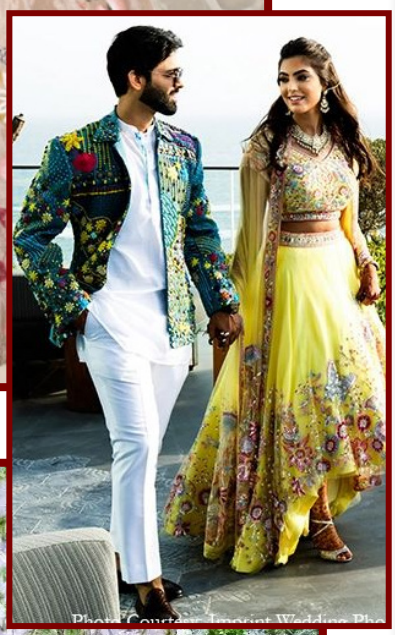

ইথিরিয়াল থিম

পোশাক হবে স্বপ্নের মতো যা কিনা এই পৃথিবীতে থেকে কল্পনাও করা যায় না বলা যেতে পারে, স্বর্গীয় কিংবা কল্পনাতীত সুন্দর! এরকম কোনও বিয়ে বাড়ির জন্য লাল, কমলা, উজ্জ্বল গোলাপি পোশাক ব্যবহার করা যেতেই পারে। মহিলারা শাড়ির সঙ্গে ওড়না এবং চাদর/শাল একসঙ্গে স্টাইল করতে পারেন, পুরুষরা ধুতি, কুর্তা, ওড়না, চাদরে সৃষ্টি করতে পারেন এক স্বর্গীয় সাজপোশাক।

হুইমজিকাল থিম

এবারের বিয়ের মরশুমে হুইমজিকাল থিমের পোশাকেও দেখা যেতে পারে বর, কনে কিংবা নিমন্ত্রিতদের। বিশেষত ডেসটিনেশন ওয়েডিং-এর ক্ষেত্রে এই ধরনের পোশাক বেশি করে চোখে পড়বে। কারণ অল্প এলিমেন্টেই অনেকখানি এক্সট্রাভ্যাগেন্ট লুক তৈরি করতে পারে। হুইমজিকাল থিম-এ নির্দিষ্টভাবে ফরমাল বা ট্রাডিশনাল ডিজাইনের দরকার পড়ে না। এর মধ্যে যেমন হাই-লো হেমলাইন থাকবে, তেমনই থাকবে এক্সট্রাভ্যাগেন্ট স্লিভ-এর ব্যবহার। এছাড়াও আমরা দেখতে পাব বিভিন্ন আনইউজুয়াল কাটস, এক্সেসরিজ এবং এমব্যালিশমেন্ট-এর ব্যবহার।

মডার্ন মিক্সড উইথ ট্র্যাডিশনাল থিম

প্রাক্তন ট্রাডিশনাল চিন্তাভাবনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে মডার্ন চিন্তাভাবনা। সে বিয়ে বাড়ির সাজ পোশাকই হোক কিংবা বিয়ের জায়গা সাজানোর থিম অথবা খাওয়াদাওয়া কিংবা পোশাক। এক্ষেত্রে পুরুষরা শার্ট আর কুর্তার মাঝামাঝি এক ধরনের কুর্তা ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে থাকবে সিগারেট প্যান্ট আর পাজামার মাঝামাঝি এক ধরনের ট্রাউজার। মহিলাদের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

ক্ষেত্রে এথনিক গাউন উইথ হাই স্লিট চোখে পড়বে। ঠিক একইভাবে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন-এর প্রচুর ব্যবহার করা যেতে পারে।

শাড়ির সঙ্গে কেপ বা জ্যাকেট একসঙ্গে স্টাইল করা যেতে পারে। লেহেঙ্গার সঙ্গে পরা যেতে পারে ক্রপ টপ অথবা শার্ট, প্যান্ট শাড়ি কিম্বা শাড়ি গাউন ও ট্রাডিশনাল-এর সঙ্গে মডার্ন টুইস্ট দেবে, এই ধরনের পোশাক ট্রাভেলিং-এর জন্যও ভালো।

এছাড়াও এবার বিয়ের মরশুমে ট্রেন্ড করবে, মিস ম্যাচ ব্রাইডস মেডদের পোশাক, বার্বি থিম-এর মহিলাদের পোশাক, পার্সোনালাইজড এমবালিশমেন্ট অ্যান্ড এক্সেসারি, ভেল-এর ব্যবহার, আইভরি বা সাদা পোশাক, উজ্জ্বল রঙের পোশাক, অ্যাটাচড ওড়না, মিনিমালিস্ট পোশাক, ছোট ব্লাউজ, মারমেইড লেহেঙ্গা, কনট্রাস্ট কালার কম্বিনেশন, ফ্লোরাল ট্যাক্সেডো, ফ্লোরাল শেরওয়ানি, ফ্লোরাল লেহেঙ্গা, শাড়ি, ওড়না, পুরুষদের পোশাকেও জরি/চুমকির কাজ, লেয়ারিং ইত্যাদি।

শীতকালের বিয়েবাড়ি, তাও যদি হয় ডেস্টিনেশন ওয়েডিং তাহলে তো আর কথাই নেই, সাজগোজ, খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে জুড়ে যাবে বেড়ানো, আর টুকটাক কিছু ছোটখাটো জিনিস সঙ্গে রাখলেই আলাদা করে বেড়াতে যাওয়ার লাগেজ নিতে হবে না, তাই এমন সুযোগ এলে মিনিমালিস্ট অথবা ফাজ ফ্রি পোশাক বেছে নেওয়া ভালো। তবে এক্ষেত্রে জুতোর দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে জুতো যেন কমফোর্টেবল হয়, এক্সেসারি কম কিন্তু স্টেটমেন্ট পিস নেওয়া ভালো, সানগ্লাস আর সানস্ক্রিন অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। তাহলেই সম্পূর্ণ ট্রিপটা এনজয় করা যাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পথে যেতে যেতে

হাতে দিন কয়েকের ছুটি পেলে মনটা উরু উড়ু করে? ব্যাগ গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে? মন বলে দিকশূন্যপুরের দিগন্তে হারিয়ে যেতে? অথচ ভিড়ভাট্টা, কোলাহল একেবারেই না পসন্দ! যাদের বেড়াতে যাওয়ার লিস্টে সবসময় এক নম্বরে থাকে অফবিট ডেস্টিনেশন, এই সংকলন তাদের কাজে লাগবে কথা দিলাম।

নিরবতার প্রেমে মজে অফবিট ডেস্টিনেশনে যাওয়ার প্ল্যান তো করেছেন, তবে সেখানে পছন্দ মতো খাবার নাই পেতে পারেন, একথা মাথায় রাখতেই হবে। বিশেষ করে সঙ্গে যদি ছোট ছানারা থাকে। কী ধরনের খাবার সঙ্গে নিতে পারেন এইরকম ট্রিপে, যা ছোট থেকে বড় সবারই উদরপূর্তি করবে রইলো এমন একডজন রেসিপি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

টম্যাটো স্যুপ উইদ গার্লিক ব্রেড

অঞ্জুশ্রী মাণ্ডি

কী কী লাগবে

টম্যাটো ২৫০-৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ছোট একটা কুচোনো, রসুন ৫/৬ কোয়া, আদাকুচি অল্প ২/৩ টুকরো, শুকনোলঙ্কা ১টি, তেজপাতা ১টি, গাজর অর্ধেক, মাখন ১ চামচ, শালিমার সাদা তেল ২ বড় চামচ, গোলমরিচ গোটা ১ চামচ, বেসিল, ফ্রেশ ক্রিম সাজানোর জন্য (optional)

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে টম্যাটোগুলো কেটে অল্প নুন ছড়িয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। বাকি জিনিসগুলো (পেঁয়াজ, আদা, গাজর) কেটে নিতে হবে। একটা প্যানে সাদা তেল আর সামান্য মাখন গরম করে ওতে একে একে রসুন কোয়া, আদার টুকরো, পেঁয়াজকুচি, গোটা শুকনোলঙ্কা, গোটা গোলমরিচ আর তেজপাতা দিয়ে নেড়েচেড়ে একটু ভাজা ভাজা হলে ওতে কেটে রাখা টম্যাটো আর গাজর দিয়ে ঢেকে দিয়ে রান্না করতে হবে। টম্যাটো নরম হয়ে গলে গেলে দু থেকে তিন কাপ জল দিয়ে ফুটতে শুরু করলে অল্প কাশ্মীরি লাল লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে, যাতে কোনও কাঁচা গন্ধ না থাকে। এরপর টম্যাটোর এই মিশ্রণটি ছেঁকে নিতে হবে। টমেটোর স্টকটা রেখে বাকি অংশ থেকে তেজপাতা তুলে নিয়ে মিক্সিতে দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। এরপর প্যানে টম্যাটোর স্টক, সঙ্গে কিছু বেসিল আর সঙ্গে টম্যাটোর পেস্ট দিয়ে ভালো করে নেড়ে একটু টম্যাটো কেচাপ স্বাদ অনুসারে নুন আর চিনি (অপশনাল) দিয়ে মিনিট সাতেক মতো ফুটিয়ে নিতে হবে। একটু ঘন হয়ে এলে আঁচ বন্ধ করে গরম গরম টম্যাটো স্যুপ উপর থেকে একটু ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে গার্লিক ব্রেডের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

scan me

Mera Pyar Shalimar...

100% Vegetarian

Shalimar's®

COCONUT OIL • MUSTARD OIL • SUNFLOWER OIL • SHALIMAR'S AYURVEDIC JASMINE COCONUT OIL • AMLA OIL
MOISTURIZING BODY OIL • CHEF SPICES • MEAT MASALA • CHICKEN MASALA • GARAM MASALA • KASHMIRI MIRCH MASALA

সবুজ মুগের চিল্লা

কী কী লাগবে

সবুজ মুগ ডাল ১ কাপ, সুজি ১/২ কাপ, মৌরি ১চা-চামচ, জোয়ান ১/২ চা-চামচ, বেকিং সোডা ১/২ চা-চামচ, নুন+বিট নুন ১+১/২ চামচ, ঘি ১ চামচ, শালিমার সাদা তেল পরিমাণমতো, আদাকুচি ১ বড় চামচ, পেঁয়াজকুচি ১টা মাঝারি, টম্যাটোকুচি ১টা মাঝারি, ক্যাপসিকামকুচি ১টা

কীভাবে বানাবেন

একটা বাটিতে মুগ ডাল পেস্ট, সুজি, বেকিং সোডা আর নুন ভালো করে মিশিয়ে মিনিট ১৫ ঢেকে রাখতে হবে। ১৫ মিনিট পর ঢাকা খুলে আদাকুচি আর প্রয়োজনে একটু জল দিয়ে ব্যাটারটা পাতলা করে নিতে হবে। এরপর একটা নন স্টিক প্যানে তেল আর ঘি গরম করে হাতা দিয়ে ব্যাটার দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে, আর উপরে কুচোনো সবজিগুলো দিয়ে মাঝারি আঁচে মিনিট পাঁচ-সাত ঢেকে রান্না করতে হবে। একটা দিক হয়ে গেলে চিল্লাটা উল্টে অল্প একটু তেল দিয়ে আরও কিছুক্ষণ (৫-৭ মিনিট) রান্না করে, দু দিক ক্রিসপি হলে চিল্লাটা তুলে নিতে হবে। গরমাগরম সবুজ মুগের চিল্লা টম্যাটো সস, রায়তা বা কোনও চাটনি দিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গর্বের
১২৫
বছর
১২৫ বছর ধরে
আপনার শুভক্ষণের সাথী
কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র
গৃহ পূজন সামগ্রী
বিবাহ সামগ্রী
রান্নার বাসনপত্র
ষ্টীলের সামগ্রী
বগলা চরণ কুণ্ডু
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন
Shyambazar Five Point
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004
WE HAVE NO BRANCH
7980603470
www.bagalacharankundu.com
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560

গ্রিন মুগলেট

কী কী লাগবে

সবুজ মুগ দেড় কাপ, কড়াইশুঁটি ১/৩ কাপ আদাকুচি দেড় চামচ, পেঁয়াজকুচি ১টা বড়, টম্যাটোকুচি ১টা, ক্যাপসিকামকুচি, ধনেপাতাকুচি, লঙ্কাকুচি, কারিপাতা, ইনো ১ প্যাকেট, নুন স্বাদ অনুসারে, জল, শালিমার সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

ব্লেন্ডারে ভেজানো সবুজ মুগ ডাল জল, মটরশুঁটি, আদা আর জল দিয়ে একসঙ্গে পেস্ট করে নিতে হবে। মিশ্রণটি একটা বাটিতে ঢেলে ওতে সব কুচোনো সবজি দিয়ে, নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। শেষে ইনো দিয়ে আরও একবার ভালো মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর প্যানে তেল গরম করে হাতা দিয়ে ব্যাটারটা দিয়ে হালকা করে পুরো প্যানে ছড়িয়ে, সাইড থেকে একটু তেল দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে রান্না হবে একটু বাদামি আর ক্রিসপি হওয়া অবধি। এরপর উল্টে দিয়ে আর একটু তেল দিয়ে অপর পিঠটা ক্রিসপি হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। দু'দিক ক্রিসপি হলে প্যান থেকে নামিয়ে নিলেই তৈরি গ্রিন মুগলেট। এটা যে-কোনও সস, রায়তা বা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফ্রেঞ্চ টোস্ট

কী কী লাগবে

ডিম ২-৩টি, নুন স্বাদ অনুসারে, গোলমরিচগুঁড়ো অল্প, দুধ ২ বড় চামচ, পাউরুটি স্লাইস ৬টি, শালিমার সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে একটা বাটিতে ডিম, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে ওতে দুধ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর প্যানে তেল গরম করে, একটা করে পাউরুটি ডিমের গোলায় ডুবিয়ে প্যানে দিয়ে দুদিকে সোনালি রং হলে টোস্টগুলো প্লেটে সাজিয়ে সস এর সঙ্গে পরিবেশন করুন গরমাগরম ফ্রেঞ্চ টোস্ট।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

nanighar
ghar se dil tak

Purely
Homecooked
(not Homelike)
Thalis

Veg Thali
Chicken Thali
Fish Thali
Mutton Thali

Starting from
99/-
only*

#MaaKaHaatKaKhana

ORDER NOW

CALL US AT
6289961646 or 6289909399

VISIT US AT
www.nanighar.com

KOLKATA
GURGAON
DELHI

FOLLOW US ON

DOWNLOAD OUR APP FROM
Google play
App Store

স্টিমড চিকেন মোমো

কোয়েল বাগ যশ

কী কী লাগবে

২ কাপ ময়দা, ২ চামচ তেল, ১ কাপ চিকেন কিমা, ১ কাপ পেঁয়াজকুচি, ১ চামচ আদাকুচি, ১/২ কাপ ধনেপাতাকুচি, ২ চামচ বাটার, নুন

কীভাবে বানাবেন

একটি বাটিতে চিকেনের কিমা, পেঁয়াজকুচি, আদাকুচি, ধনেপাতাকুচি, নুন আর মাখন নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। অন্য একটি বাটিতে অল্প নুন আর পরিমাণমতো জল দিয়ে ময়দা শক্ত করে মেখে নিন। লেচি কেটে পাতলা করে ফেলে মাঝে পুর ভরে ইচ্ছে মতো শেপে মোমোগুলো গড়ে নিন। ২০-২৫ মিনিট স্টিম করে ঝাল ঝাল চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

JIVO

India's Healthiest Cooking Oil enriched with Omega-3

JIVO

JIVO WELLNESS PVT. LTD.
J-3/190, Nehru Market,
Rajouri Garden, New Delhi -110027
Ph: +91-9911927833, +91-8447171787
E-mail: info@jivo.in, karanpreet@jivo.in
Web: www.jivowheatgrass.com

পোহা

কী কী লাগবে

চিঁড়ে ২ কাপ, পছন্দমতো সবজি কুচোনো ১ কাপ, নুন চিনি স্বাদমতো, পেঁয়াজকুচি ২ চামচ, চিনেবাদাম ২ চামচ, কাজুবাদাম, শালিমার শেফ মশলা হলুদগুঁড়ো ১/২ চামচ, কারিপাতা, কালো সর্ষে ১/২ চামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি ১ চামচ, শালিমার সাদা তেল ২ চামচ

কীভাবে বানাবেন

চিঁড়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। তেল গরম করে বাদাম ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলে কালো সর্ষে আর কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে একে একে পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি, কুচোনো সবজি, নুন, চিনি, হলুদগুঁড়ো দিয়ে ভাজা ভাজা হলে ধুয়ে রাখা চিঁড়ে আর ভাজা বাদাম দিয়ে মিশিয়ে কিছু সময় রেখে নামিয়ে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮

বাংলার নিজের চ্যানেল

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

বাংলা টেলিভিশনের সবথেকে বেশি সময় ধরে চলা কুকিং শো 'রাঁধুনি' পা রাখলো ১৬ বছরে।

এতদিন ধরে আপনাদের রসনা ও হৃদয় জয় করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

'রাধুনি'-তে অংশগ্রহণ করতে চোখ রাখুন আকাশ আটের পর্দায়।

প্রতিদিন, দুপুর ১:৩০ ও বিকেল ৫:৩০

আকাশ আট দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দেখতে না পেলে আপনার কেব্‌ল বা ডি টি এইচ অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

হাক্কা নুডলস্

কী কী লাগবে

নুডলস, লম্বা করে কাটা লাল হলুদ সবুজ ক্যাপসিকাম, জুলিয়ান কাট গাজর, গোলমরিচগুঁড়ো, নুন, রসুনকুচি, পেঁয়াজকুচি, ভিনিগার, কাঁচালঙ্কাকুচি, বাঁধাকপিকুচি, স্প্রিং অনিয়নকুচি, শালিমার সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে নুডলস সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। এবার প্যানে সাদাতেল গরম করে তার মধ্যে পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি দিয়ে ২-৩ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। সামান্য ভিনিগার আর সবজি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে নুডলস দিয়ে হালকা হাতে নেড়ে নিলেই তৈরি। নামানোর পর স্প্রিং অনিয়ন কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নিরামিষ ঘুগনি

কী কী লাগবে

মটর ২ কাপ, টম্যাটো ৪টে (কুচোনো), আদা দেড় ইঞ্চি (কোরানো), আলু ১টা ছোট (ডুমো করে কাটা), পাঁচফোড়ন দেড় চা-চামচ, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, শুকনোলঙ্কা ২টো, হিং ১ চিমটি, তেঁতুলের ক্বাথ ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১টা, শালিমার শেফ মশলা হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, শালিমার শেফ মশলা লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, ভাজা মশলা আধ চা-চামচ, শালিমার সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, নারিকেলকুচি ২ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, ধনেপাতাকুচি একমুঠো

কীভাবে বানাবেন

হলুদ মটর পরিষ্কার জলে ভাল করে ধুয়ে নিন। অন্তত ৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন। সারারাত ভিজিয়ে রাখলে ভাল। এবার মটর আর আলু প্রেসার কুকারে নুন, হলুদ দিয়ে ২টো হুইশল ওঠা পর্যন্ত সিদ্ধ করে নিন। আঁচ বন্ধ করুন। কড়াইতে মাঝারি আঁচে পাঁচফোড়ন শুকনো নেড়ে নিয়ে গুঁড়ো করে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে গোটা জিরে, শুকনোলঙ্কা আর হিং ফোড়ন দিন। নারিকেলকুচি দিয়ে এক মিনিট নেড়ে টম্যাটোকুচি দিন। নুন দিয়ে তেল ছেড়ে আসা পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। তেল ছাড়তে শুরু করলে আদা, হলুদ আর লঙ্কাগুঁড়ো দিন। এ বার সিদ্ধ মটর কড়াইতে ঢেলে দিন। নাড়তে থাকুন। যখন ঘুগনি ফুটতে শুরু করবে ভাজা মশলা ও পাঁচফোড়নগুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। সবশেষে তেঁতুলের ক্বাথ আর লেবুর রস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে নামিয়ে নিন। পরিবেশনের আগে ধনেপাতাকুচি ও নারিকেলকোরা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এগ স্যান্ডউইচ

সঞ্চিতা দাস

কী কী লাগবে

পাউরুটি ৪ টুকরো, গ্রেট করা গাজর ১ টেবিল চামচ, ক্যাপসিকামকুচি ১ টেবিল চামচ, টম্যাটোকুচি ১ টেবিল চামচ, মেয়োনিজ ২ টেবিল চামচ, টম্যাটো সস দেড় টেবিল চামচ, সিদ্ধ ডিম ২টি, গোলমরিচগুঁড়ো দেড় চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি ১ টেবিল চামচ, শালিমার সাদা তেল বা মাখন ১ টেবিল চামচ, গ্রেট করা চিজ ১ টেবিল চামচ

কীভাবে বানাবেন

পাউরুটির স্লাইসের ধার কেটে মাখন লাগিয়ে নিন। সিদ্ধ ডিম স্ম্যাশ করে একে একে সব উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। একটা স্লাইসের ওপর এই মিশ্রণ রেখে আরেকটি স্লাইস দিয়ে চাপা দিয়ে দিন। মাঝখান থেকে কেটে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিকেন খাস্তা কচুরি

কী কী লাগবে

মিহি চিকেন কিমা ১৫০ গ্রাম, রসুন কিমা ২ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা স্বাদমতো, নুন পরিমাণমতো, শালিমার সাদা তেল প্রয়োজনমতো, ঘি প্রয়োজনমতো, আমচুর পাউডার ১ চা-চামচ, শালিমার শেফ মশলা গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ময়দা দেড় কাপ, জোয়ান ১ চিমটে, চিনি প্রয়োজনমতো, রোস্টেড ছাতু ১ টেবিল চামচ

কীভাবে বানাবেন

ময়দা চালুনিতে চেলে নিয়ে তাতে পরিমাণমতো নুন, চিনি, জোয়ান আর ঘি দিয়ে ময়ান দিতে হবে। ময়ান এমন হবে যেন মুঠোয় নিয়ে এক জায়গায় হয় আবার মুঠো ছেড়ে দিলে তা ভেঙে যায়। রোস্টেড গরমমশলাগুঁড়ো, শুকনো ময়দায় মিশিয়ে নিলে স্বাদ ভালো আসে।এখন অল্প অল্প উষ্ণ গরম জল দিয়ে ময়দা মেখে একটা ভেজা কাপড়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। এবার প্যানে ২ টেবিল চামচ সাদা তেল গরম করে তাতে রসুনকুচি দিয়ে হালকা নেড়ে চিকেন কিমা দিতে হবে। আদাবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা মিশিয়ে পরিমাণমতো নুন, চিনি দিয়ে কষুন। অল্প জল দিয়ে কিমা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এতে আমচুর পাউডার, রোস্টেড গরমলমশলার গুঁড়ো এবং সবশেষে রোস্টেড ছাতু মিশিয়ে টাইট পুর বানিয়ে নিন। এবার মেখে রাখা ময়দা থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিয়ে এতে চিকেন কিমার পুর ভরে হাতের তালুতে রেখে হালকা চাপ দিয়ে প্রত্যেকটা কচুরি গড়ে নিন। বড় কড়াইতে ঘি আর সাদা তেল মিশিয়ে হালকা গরম অবস্থায় কচুরিগুলো ছেড়ে সময় নিয়ে প্রত্যেকটা কচুরি বেশ লাল করে ভেজে নিলেই তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিজি আলু পনির পরোটা

কী কী লাগবে

আলু ৩টে বড় সাইজের, পনির ২০০ গ্রাম, চিজ ১৫০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৮টি, পেঁয়াজ ১টি বড়ো মিহি করে কুচোনো, রসুন ৪ কোয়া মিহি করে কুচোনো, ধনেপাতা মিহি করে কুচোনো বড় চামচের ৫ চামচ, আটা ৫০০ গ্রাম, গোলমরিচ ১ চা-চামচ, শালিমার সাদা তেল পরিমাণমতো, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

কীভাবে বানাবেন

আটা, নুন, তেল ভালো করে মিশিয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে মেখে রাখুন। আলু সিদ্ধ করে ভালো করে চটকে তার সঙ্গে পনির মিশিয়ে নিন। তেল গরম করে একে একে রসুনকুচি, পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি দিয়ে ভাজুন। মিশিয়ে রাখা আলু ও পনিরের মিশ্রণ, নুন, চিনি, গোলমরিচগুঁড়ো, চিজ, ধনেপাতাকুচি ভালো করে মিশিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে আটার লেচি কেটে তার মধ্যে পুর রেখে পরোটাগুলো বেলে নিন। তাওয়ায় তেল দিয়ে মুচমুচে করে ভেজে তুলে নিলেই তৈরি। আচার ও মেয়োনিজ-এর সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সুইট কর্ন পরোটা

কী কী লাগবে

ময়দা ২ কাপ, সুইট কর্নবাটা ১/২ কাপ, মৌরিগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, নুন-চিনিস্বাদমতো, ধনেপাতাকুচি ১ চা-চামচ, আলু ১টি, ভাজার জন্য শালিমার সাদা তেল।

কীভাবে বানাবেন

একটি পাত্রে সাদা তেল ছাড়া বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে মেখে রাখুন একঘণ্টা। লেচি কেটে ইচ্ছেমতো শেপে বেলে ডুবো তেলে ভেজে অথবা তাওয়াতে সেকে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পাখিদের সন্তানস্নেহ

আবীর গুপ্ত

ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের সাদা ভ্যারাইটি

স্ত্রী ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার (সাদা ভ্যারাইটি) ডিমে তা দিচ্ছে।

পুরুষ রুফাস ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার শাবকদের খাওয়াচ্ছে।

মানবসমাজে বাবা-মায়েরা নিজেদের সন্তানদের জন্য কত কী না করে! বাবা-মা সন্তানদের জন্য কতদূর যেতে পারে তার এমনকিছু নজির আছে যা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। পশু-পাখিদের মধ্যেও কি এরকম সন্তান স্নেহ দেখা যায়? পাখিদের ছবি তুলতে গিয়ে বেশকিছু এ ধরনের অদ্ভুত নজিরের কথা জানতে পেরে অবাক হয়ে গেছি। তাহলে শুরু করা যাক, পাখিদের সন্তানস্নেহ নিয়ে এই গল্প।

২০২৪ সালের মে মাসের প্রথম দিকে এক রবিবার সকালে ক্যামেরা কাঁধে চলে গিয়েছিলাম পূর্বস্থলীতে। খবর এসেছিল ওখানে ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার-এর বাচ্চা হয়েছে। গিয়ে দেখি অধমের মতো আরও বহু পাগল সেখানে হাজির হয়েছেন ছবি তোলার জন্য। সকাল থেকে প্রায় সাত ঘণ্টা খুব কাছ থেকে বাবা-মা'র সদ্যোজাত শাবকদের প্রতি আচরণ ও কর্তব্য পালন দেখেছিলাম, বহু ছবিও তোলা হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারে দু'রকম গায়ের রঙের পাখি দেখা যায়। একটি সাদা ভ্যারাইটি আর অন্যটি রুফাস ভ্যারাইটি। দুরকমের পাখিরই স্ত্রী পাখির লেজ ছোট হয়,

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

স্ত্রী রুফাস ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার শাবকদের খাওয়াচ্ছে।

স্ত্রী রুফাস ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার শাবকদের খাওয়ানোর জন্য ফড়িং নিয়ে এসেছে।

কিন্তু দেহের রং রুফাস হয়। শুধু পুরুষ পাখিদের মধ্যে রঙের পার্থক্য দেখা যায়। দুরকমের পাখিকেই ক্যামেরা বন্দি করতে পেরেছি যদিও সাদা ভ্যারাইটিকে তার বাসায় পেলেও, তখনও ডিম ফুটে শাবকের জন্ম হয়নি তাই শাবকদের দেখা পাইনি। কিন্তু শাবকদের দেখা পেয়েছি রুপাস ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে। মা ও বাবা পাখি ঘুরে ঘুরে পোকামাকড় কিংবা অন্য খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে, বাসায় এসে শাবকদের মুখের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে সেই খাবার চিপে তার রসটা ফেলে দিচ্ছে। কারণ শাবকগুলো এত ছোট, এতই শিশু যে ওই খাবার গিলে খাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। মা ও বাবা পাখি কীটপতঙ্গ চিপে তার নির্যাস বাচ্চার মুখে ফেলে বাকিটা ওই বাসাতেই রেখে দিচ্ছে, পরে আবার সেটা তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ফেলে দিচ্ছে, কখনওবা নিজেই খেয়ে নিচ্ছে। এভাবে ওই ছোট্ট বাসাটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছে, যাতে সদ্যোজাত শাবকদের কোনও অসুবিধা না-হয়। পাখিদের এরকম বহু সন্তানস্নেহের নজির ক্যামেরাবন্দি করা গেছে। পাখিদের মধ্যেও ঘর বাঁধার আগে পুরুষ ও স্ত্রী পাখিদের মধ্যে পরস্পরকে পছন্দ করার ব্যাপার থাকে। কয়েক প্রজাতির পাখিদের ক্ষেত্রে বিষয়টা বেশ ইন্টারেস্টিং।

অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের বাওয়ার পাখির বিবাহবাসর দেখলে যে-কেউ লজ্জা পেয়ে যাবে, ওদের রুচিবোধের প্রশংসা না-করে পারবে না। ছেলে বাওয়ার পাখিরা বিয়ের আগে প্রথমে বাসরঘরের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বার করে। তারপর সেখানে লেজ দিয়ে খানিকটা জায়গা এমনভাবে ঝাঁট দেয় যাতে এতটুকু ধুলো বা ময়লা সেখানে না-থাকে। তারপর সমান্তরালভাবে দু'সারি প্রায় তিনফুট লম্বা কাঠি এমনভাবে মাটিতে পোঁতে যাতে দুধারের সমান্তরাল কাঠিগুলো ভিতরের দিকে নুয়ে থাকে। এরপর নানারকম রঙিন ফুল, পাতা, পাপড়ি এনে ওই নুয়ে পড়া কাঠিগুলোর উপর সাজিয়ে দেয়। মেঝেতেও ফুলের পাপড়ি, ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ফুলশয্যার শয্যা তৈরি করে। এরপর ওই বাসরঘর রং করার জন্য নানা রঙিন ফল সংগ্রহ করে ঠোঁট দিয়ে চিপে রস বার করে ওই ঘরের উপর ছড়িয়ে দিয়ে রঙিন করে তোলে। রং লাগানোর সময় ঠোঁটে করে পাতা নিয়ে গিয়ে পাতা দিয়ে রং লাগায়। এরপর পাত্রী বা কনে জোগাড় করার পালা। নানারকম কায়দাকানুন লাফালাফি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করে মেয়ে বাওয়ারদের খুশি করার চেষ্টা করে। কোনও মেয়ে বাওয়ার খুশি হয়ে ওই ঘরে বা কুঞ্জে এলে তখন তাকে বউ হিসেবে গ্রহণ করে।

বায়া উয়েভার বার্ড (Baya Weaver Bird), বৈজ্ঞানিক নাম প্লোমিয়াস ফিলিপিনাস (Plomieus philippinus), বাংলা নাম বাবুই পাখি, যারা বাসা তৈরির জন্য বিখ্যাত। এরা দেখতে স্ত্রী চড়াই পাখির মতো, শুধু এদের ঠোঁট মোটা আর লেজ ছোট। খেতের চারপাশে ঝাঁকবেঁধে থাকে। এদের বাসা তৈরির কৌশলটা এরকম, প্রথমে পুরুষ পাখিরা একটির পর একটি বাসা তৈরি করে যায় কিন্তু কোনওটিই শেষ করে না। স্ত্রী পাখিরা ফাইনাল টাচ্ দিয়ে শেষ করে। তারপর স্ত্রী পাখিরা ওই বাসাগুলির দখল নেয়। প্রতিটি বাবুই একাধিক বাসা যেমন বানায় তেমনই একাধিক সংসারও পাতে। ঝুলন্ত বাসাগুলি দেখতে বকযন্ত্রের মতো। বাসার ভিতরে আবার ডিম রাখার জন্য আলাদা চেম্বার থাকে। ওই চেম্বারে নরম কাদা লেপে দেয় যাতে ডিম ফুটে শাবক জন্মালে তাদের কোনও অসুবিধা না-হয়। ২-৪টি ডিম পাড়ে।

পাখিদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ ও স্ত্রী পাখি যৌথভাবে ডিম বা শাবকদের দেখাশোনা করে। শাবকরা যখন উড়তে শিখে যায়, নিজের খাবার নিজেই জোগাড় করার ক্ষমতা অর্জন করে, তখন বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যায়।

সাধারণত বাবা কিংবা মা পাখিরা ডিমে তা দেয় যাতে ডিম ফুটে শাবকের জন্ম হয়। কিন্তু এমন পাখিও আছে যারা মোটেই ডিমে তা দেয় না। ডিমে তা দেওয়ার প্রয়োজন তাপ সৃষ্টির জন্য, যাতে ডিম ফুটতে অসুবিধা না-হয়। এই তাপ বেশি বা কম হলে কিন্তু ডিম নষ্ট হয়ে যাবে, শাবকের জন্ম হবে না। অস্ট্রেলিয়ার একধরনের ফেজন্ট পাখি আছে যার নাম মেগাপোডে। ডিম পাড়ার অনেক আগেই, ওরা পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে একটা গোলাকার গর্ত তৈরি করে। এই গর্তের মাপ মোটামুটি তিন থেকে চার ফুট ব্যাসের আর দু থেকে তিন ফুট গভীর। ওই গর্তে লতাপাতা, বালি, মাটি ইত্যাদি দিয়ে ভরাট করে। বাসাটা মাটির থেকে উঁচু হয়ে থাকে। অনেকটা শঙ্কুর মতো বা আগ্নেয়গিরির মতো দেখতে হয়ে যায়। একটা সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে ভিতরে মেয়ে পাখি ডিম পেড়ে বাইরে এসে ওই সুড়ঙ্গের মুখও বন্ধ করে দেয়। ওই ঢিপির ভিতরে ডিমের জায়গায় উষ্ণতা যদি সঠিক না-থাকে তবে ডিম নষ্ট হয়ে যাবে। তাই, বাবারা মাঝে মাঝেই ঢিপিতে গর্ত

স্ত্রী রুফাস ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার বাসা থেকে ময়লা বার করছে।

স্ত্রী রুফাস ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার বাসা থেকে ময়লা বার করে ফেলতে যাচ্ছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করে মুণ্ড ভিতরে ঢুকিয়ে ভিতরের তাপমাত্রা দেখে নেয়। কমে গেলে ঢিপির উপর আরও লতাপাতা চাপায় আর বেড়ে গেলে কিছু লতাপাতা, বালি ঢিপির উপর থেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু ওরা কী করে কোন অঙ্গের সাহায্যে ভিতরে সঠিক তাপমাত্রা আছে কিনা তা বুঝতে পারে তা এখনও বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি।

মেয়ে ধনেশ পাখিদের ভাগ্য দারুণ ভালো। ডিম পাড়ার আগে থেকে শুরু করে ডিম ফুটে শাবকের জন্ম হওয়া অবধি বাবারা যা করে তা নজিরবিহীন। ডিম পাড়ার আগে মেয়ে ধনেশরা কোনও একটা গাছের গুড়ির গর্ত খুঁজে বার করে তাতে ঢুকে পড়ে। তারপর কাদামাটি, নিজেদের বিষ্ঠা দিয়ে ওই মুখ বন্ধ করে দেয়। শুধু সরু একটা ছিদ্র রেখে দেয়। তারপর মেয়ে ধনেশ পাখি ভিতরে বহাল তবিয়তে খোশমেজাজে থাকে আর বাইরে ভাবী বাবাকে হুকুম করে খাবারদাবার জোগান দিতে। বাইরে ভাবী বাবা সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে ওই সরু ছিদ্র দিয়ে বউকে খাবার সাপ্লাই করে যায়। এমনকী শাবক জন্মানোর পরও বেশ কয়েকদিন এরকম করতে হয়। শাবক জন্মানোর পর স্বাভাবিকভাবেই পরিশ্রম আরও বাড়ে কারণ তখন তো পেটের সংখ্যা একাধিক। তারপর তিনমাস বাদে যখন মা ও শাবকরা বাইরে আসে তখন মায়ের আয়তন দ্বিগুণ আর বাবা অর্ধেক!

Conservation of mass!

পাখিরা গরম রক্তের প্রাণী আর ওদের পালক ওদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শীতপ্রধান অঞ্চলের পাখিদের নিজের দেহকে গরম রাখার জন্য, ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। নিজেদের দেহকে গরম রাখার ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ান হল এমপারার পেঙ্গুইন (বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাপটেনোডাইটেস্ ফস্টেরি)। এরা নিজেদের দেহকে গরম রাখার ব্যাপারে চ্যাম্পিয়নই শুধু নয় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। এই পেঙ্গুইনরা অ্যান্টার্কটিকার বাসিন্দা। অ্যান্টার্কটিকা পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চল। শীতকালে অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা -৫০□ সেন্টিগ্রেড অবধি নেমে যায়। শুধু তাই নয়, ওই প্রচণ্ড ঠান্ডার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে ঝোড়ো বাতাস যার গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৩০০ কিলোমিটার। এই পরিবেশে টিকে থাকার জন্য ওদেরকে নিজেদের দেহের এবং আচরণে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় কোনও পাখিই নতুন শাবকের জন্ম দিতে পারে না। এমনকী অন্যান্য প্রজাতির পেঙ্গুইনও এ ব্যাপারে অক্ষম। তাহলে ওদের শরীর গরম রাখার রহস্যটা কী?

প্রথমত নিজের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে ওই প্রচণ্ড ঠান্ডায় বেশি শক্তিক্ষয় না-হয়। দ্বিতীয়ত দেহের সঙ্গে নিচে থাকা বরফের যত কম সংস্পর্শ হয় ততই ভালো। তাই, হাঁটাচলার সময় ওদের গোড়ালি শূন্যে থাকে আর আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটে। ঠান্ডা বাড়লে কিংবা পরিবেশ আরও খারাপ হলে ওরা ওদের ডিম বা সদ্যোজাত শাবকদের পায়ের পাতার ওপর রাখে যাতে শক্তি সঞ্চয় করা যায়। এমনকী এরকমভাবে ওরা হাঁটতেও পারে।

তৃতীয়ত, ওরা এমন একটি পদ্ধতি বার করেছে যা ওদের ওই ঠান্ডায় নিজের দেহকে গরম রাখতে সাহায্য করে। সেটি হল জমায়েত বা হাডল (Huddle) পদ্ধতি। দশ বর্গমিটার জায়গায় যদি ছ-হাজার পাখি একত্রিত হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সেখানে গরম তো হবেই। বাচ্চাদের হাডলের মধ্যে রাখে। এতে দেখা গেছে প্রায় ২৫-৫০% তাপমাত্রা ক্ষয় আটকানো যায়। এই অবস্থায়, সমস্ত পেঙ্গুইনকে একসঙ্গে হেঁটে ১০০-২০০ মিটার অবধি যেতেও দেখা গেছে।

জাভা স্প্যারো পাখিটি সুন্দর দেখতে বলে বাড়িতে শোভা বাড়ানোর জন্য এদেরকে খাঁচায় পুরে বাড়ির অন্দরমহলে বা বসার ঘরে রাখা হয়। বন্দি অবস্থায় এদের প্রজনন ক্ষমতা অটুট থাকে, এটাও এদের একটি বড় গুণ। এরা নানারকম রং-যুক্ত হয়। সবচেয়ে পরিচিত পাখিটির রঙের বাহার এরকম, দেহ নীলচে ধূসর, মাথা কালো, তলপেটের কাছটা গোলাপি আভাযুক্ত, লেজ কালো আর কানের কাছটা সাদা। এদের ঠোঁট গোলাপি আর সাদা রঙের। পাখিটি লম্বায় পাঁচ ইঞ্চির মতো, যেখানে আমাদের পরিচিত চড়াই পাখির দৈর্ঘ্য ছয় ইঞ্চি, মাত্র এক ইঞ্চি কম। এই পাখিটির আসল বাসস্থান হল জাভা এবং বালির দ্বীপসমূহ, তবে কলকাতার চিড়িয়াখানা থেকে শুরু করে অনেকের বাড়িতেই হয়তো

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

স্ত্রী ব্লু টেইলড্ বী-ঈটার শাবককে খাওয়াচ্ছে।

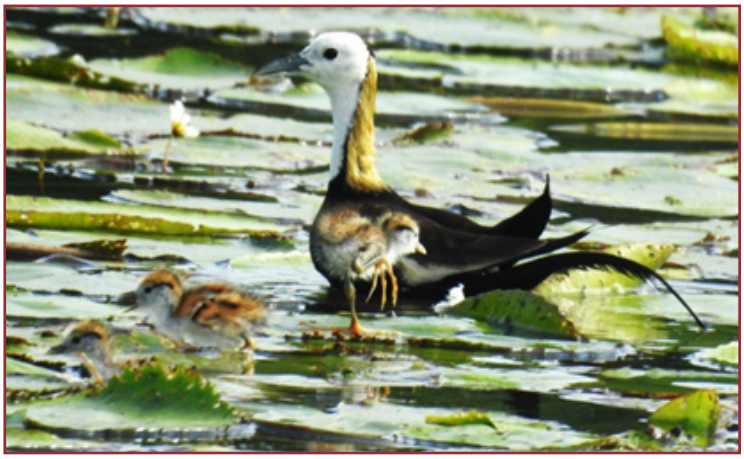

ফেজন্ট টেইলড্ জাকানা (এক প্রজাতির জলপিপি পাখি) শাবকদের ট্রেনিং দিচ্ছে।

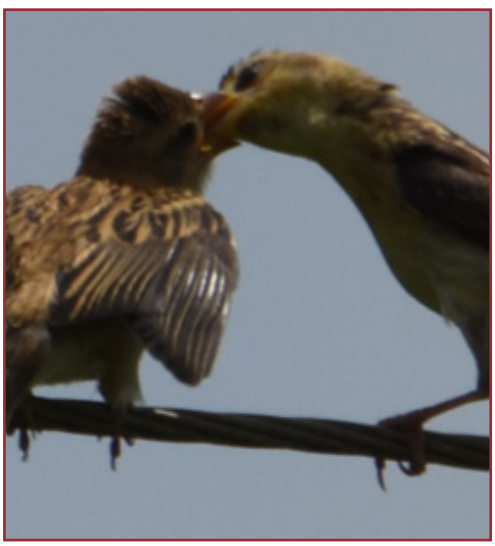

বাবুই পাখি শাবককে খাওয়াচ্ছে।

বাবুই পাখির বাদিকে পূর্ণ বাসা ও ডানদিকে পুরুষ বাবুই অর্ধেক বাসা বানিয়ে লাফালাফি করে স্ত্রী পাখিকে আকর্ষনের চেষ্টা করছে।

পাখিটিকে দেখা যাবে। সরকার আইন করে দেশি পাখিকে খাঁচায় পোষা বন্ধ করলেও এখনও বিদেশি পাখিকে খাঁচায় পোষা রমরমিয়ে চলছে।

জাভা স্প্যারোর বৈজ্ঞানিক নাম পাড্ডা অরিজিভোরা। নামটি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা এদের খাদ্যাভ্যাস শুনলেই বোঝা যাবে। এদের প্রধান খাদ্য ধান। বন্দি অবস্থাতেও এরা ধানই খেতে চায় তবে একান্তই না পেলে জীবনধারণের জন্য অন্য খাবার খেতে বাধ্য হয়। অন্য খাবার মানে সবুজ ফল/পাতা, বীজ থেকে ছোটখাটো কীটপতঙ্গ ইত্যাদি।

প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী পাখিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পুরুষ পাখিরা ঠোঁট এদিক-ওদিক দুলিয়ে লেজ নাড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নিজের প্রেম নিবেদন করে। স্ত্রী পাখি খুশি হয়ে কাছে এলে তখন গান গাওয়া শুরু করে। যদি স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখির প্রেম নিবেদনে খুশি না হয়ে তাকে প্রত্যাখান করতে চায় তখন স্ত্রী পাখি হয় পুরুষটির ঘাড়ে মাথা রাখে অথবা ঠোঁট দিয়ে তাকে আক্রমণ করে।

মিলন শেষে বাসা বাঁধার পালা। ঘাস, পাতা, ডাল ইত্যাদি দিয়ে বাসা তৈরি হয়। সাধারণত পুরুষ পাখিরা বাসা তৈরির দায়িত্ব নেয়। স্ত্রী পাখি জিনিসপত্র জোগাড় করে এনে সাহায্য করে। সবশেষে পালক দিয়ে বাসার কিনারা মোড়া হয় যাতে বাসাটি শক্তসমর্থ শুধু নয়, বাসার ডালপালা থেকে শাবক যেন খোঁচা না-খায়। পুরুষ আর স্ত্রী উভয়েই ডিমে তা দেয়। তিন সপ্তাহ বাদে শাবকের জন্ম হয়। এমনই চড়াই পাখিদের মতোই শাবকের গায়ে তখন কোনও লোম বা পালক কিছুই থাকে না। বাবা-মা উভয়েই শাবককে খাওয়ানো থেকে সবরকম দেখভালের দায়িত্ব নেয়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

ছোটখাটো চেঞ্জ কিন্তু ইমপ্যাক্ট বড়

এলিজা

শীতকাল, শীতকালীন ছুটি, বিয়ের মরশুম। বাড়িতে মানুষজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে, আর থাকে ফ্যামিলি বা বন্ধুদের নিয়ে গেট টুগেদার। এইসময়ে ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন এনে বাড়ি কি করে নতুন সাজে সাজানো যায় অথবা হঠাৎই বাড়িতে কোনও গেট-টুগেদার প্ল্যান হলে টুকটাক কিছু পরিবর্তন করে বাড়িকে কীভাবে অন্যরকম আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেই নিয়ে আলোচনা রইলো।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

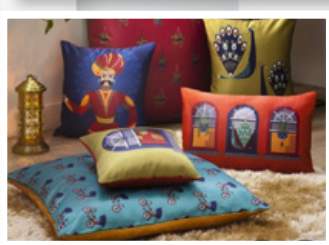

আগের থেকে যদি জানা থাকে এই মরশুমে শহরে বিয়ে বাড়ি অ্যাটেন্ড করতে আসা আত্মীয়স্বজনরা আপনার বাড়িতে উপস্থিত হতে পারেন, কিংবা আপনার যদি এনআরআই আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব থাকে কিম্বা গেট-টুগেদার এর পরিকল্পনা থাকে, তাহলে অবশ্যই শীতকাল পড়তে পড়তে বাড়ির অন্দরসজ্জায় পরিবর্তন নিয়ে আসা যায়, তবে এর মানে দেয়ালের রং থেকে ফার্নিচার সমস্ত আমূল বদলে ফেলা নয়। ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন করেই ঘরটাকে সাজিয়ে নেওয়া। যে যে ভাবে এই পরিবর্তন করা যেতে পারে-- যেমন পুজোর সময় যে-ধরনের ওয়েদার থাকে তাতে আমরা একটু ফেস্টিভ লুকের হালকা বা পাতলা পর্দার ব্যবহার করি, শীতের শুরুতেই এই পর্দাগুলো বদলে উজ্জ্বল রঙের একটু মিক্স ম্যাচ জাতীয় ভারী পর্দা ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার শীতকাল বলে আমরা পর্দায় দু'তিন রকম লেয়ার ব্যবহার করতে পারি মানে একটাই পর্দায় সামনের দিকে প্রিন্ট আর পিছনের দিকে পাতলা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

ওয়ার্ম কালারের সোফার কাভার আর থ্রোপিলো যোগ করে ঘরের চেহারা বদলে ফেলা যায়, শীতকালের উপযোগী করে। এমনকি টাসেল এর ব্যবহারও ঘরে উষ্ণতা আনে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

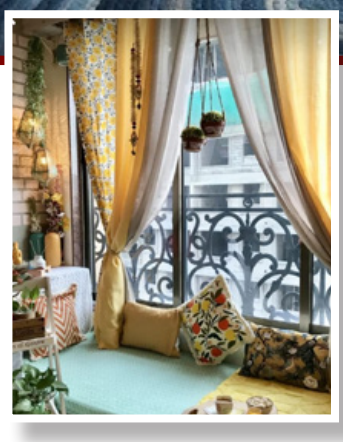

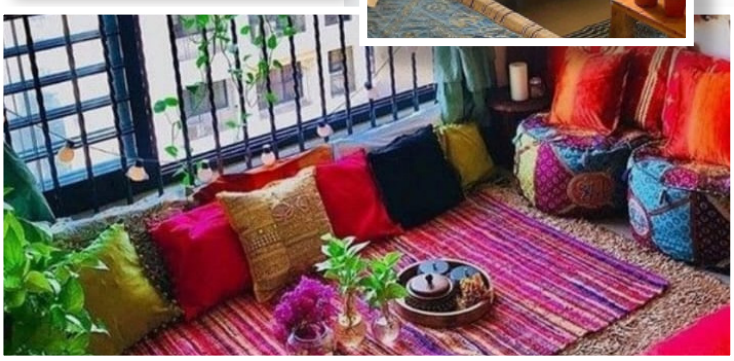

একরঙা কাপড় যেমন পর্দাটাকে মোটা করবে তেমন পর্দার ফলটাও দেখতে ভালো লাগবে।

আবার একই পর্দায় যদি ভারী মেটেরিয়াল এবং লেস জাতীয় মেটেরিয়ালের ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ কিনা একটি লেয়ার ভারী মেটারিয়ালের উপর প্রিন্ট বা এমব্রয়ডারি আর তার ওপরের লেয়ারটি লেসের কাজ করা।

ট্রান্সপারেন্ট বা ট্রান্সলুসেন্ট যদি হয়, তাহলে যে-কোনও একটি লেয়ারকে কার্টেন টাই দিয়ে বেঁধে রাখলে দুটি লেয়ারই খুব সুন্দর দেখাবে আবার দুটো লেয়ারই খোলা থাকলেও ঘরটা দেখতে যেমন সুন্দর লাগবে তেমনই ঘরের উষ্ণতা কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দেবে। শীতের সময় একটু মোটা, উজ্জ্বল রঙের এবং আরামদায়ক সোফার কাভার ইত্যাদির ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া ব্যবহার করা যেতে পারে অনেকগুলো থ্রো পিলো, একইসঙ্গে বাড়ির মেঝেতে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় কার্পেট, দুরি, রাগ এবং সোফাতেও বিভিন্ন ধরনের থ্রোজ বা রাগস ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এগুলো অনায়াসে শীতকালীন মেলা কিংবা এগজিবিশনে পাওয়া

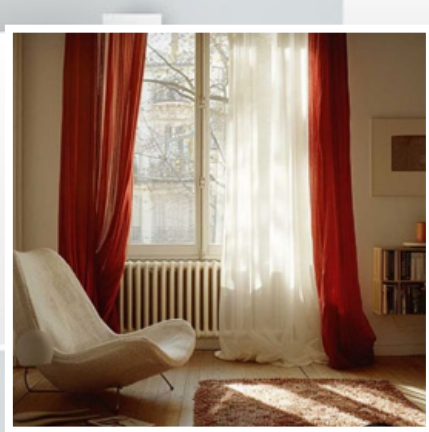

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

উল কিংবা ডেনিম দিয়ে নিজের হাতে তৈরি করে নেওয়া যায় ফ্লোর রাগ, কিংবা শীতকালীন মেলাতেও কিনতে পাওয়া যায় এই ধরনের জিনিস যা একসঙ্গে একাধিক ব্যবহার করলে শীতকালীন অন্দর সজ্জার উষ্ণতা বাড়ে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

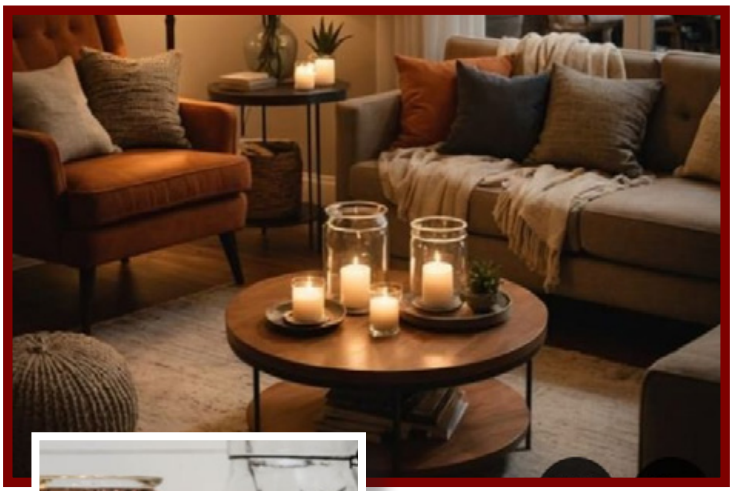

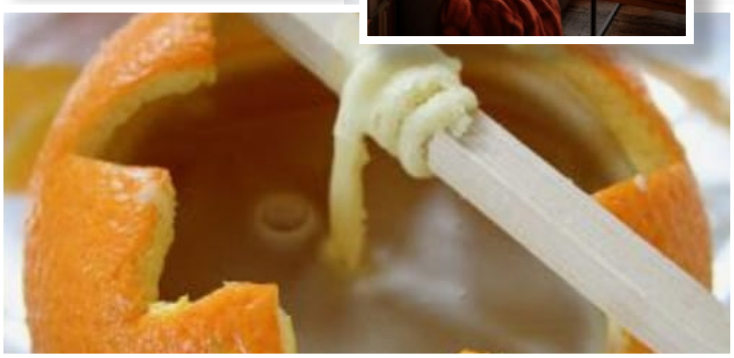

যাবে অথবা খুব সহজেই নিজে হাতেও বানিয়ে নেওয়া সম্ভব। এতে বাড়ি এসে অতিথিরা যেমন চমকে যাবেন তেমনি প্রশংসাও পাওয়া যাবে অনেক। ঘরের কোনও কোনা একেবারে অন্যরকম করে সাজিয়ে দেওয়ার এবং উষ্ণতার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে আলোর। সুগন্ধি মোমবাতি যেমন ঘরের কোনাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের পরিবেশটাই বদলে দিতে পারে, ঠিক তেমনই পুরনো কাচের জলের বোতল বা অন্য কোনও বোতলে ফেয়ারি লাইট রাখলেও গৃহসজ্জা অন্য মাত্রা পাবে। এছাড়াও ঘরের কোণের কোনো খালি দেওয়াল সাজানো যেতে পারে ফেয়ারি লাইট দিয়ে।

হাতে সময় থাকলে খুব সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন ছোটখাটো জিনিস যেমন কমলালেবুর খোসা, ছোট কাপড়ের টুকরো, দারচিনির রোল, লবঙ্গ ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজানোর টুকিটাকি তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। বেড লিনেনেও পরিবর্তন করা যায় এভাবে। এইসময়ে এধরনের ঘরের সাজের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

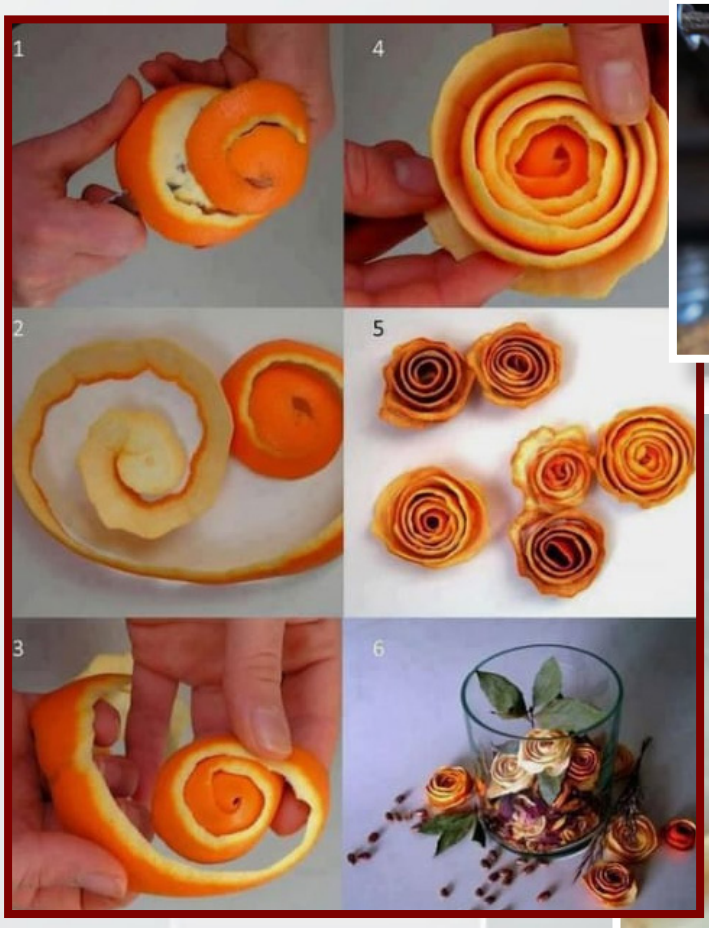

ছবি দেখে সহজেই বানিয়ে নেওয়া যায় কমলালেবুর খোসা, দারচিনি, স্টার আনিস আর ভেজিটেবল অয়েল কিংবা মোম দিয়ে তৈরি করা ঘর সাজানোর জিনিস আর সুগন্ধি মোমবাতি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট

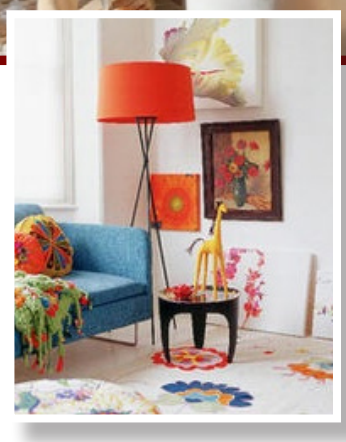

সঙ্গে অবশ্যই জুড়ে দেওয়া যায় রঙিন ফুল অথবা শুকনো পাতার ডেকোরেশন। বাড়িতে ছোটরা থাকলে অবশ্যই ক্রিসমাস থিম-এ সাজানো যায় বাড়ি, তাতে ফেয়ারি লাইট, স্টারস, ক্রিসমাস ফ্ল্যাগ, ক্রিসমাস ট্রি, আর্টিফিশিয়াল স্নো, বেলুন এবং ক্রিসমাসের গিফট সক্স দিয়েও সাজানো যায়।

হাতে যদি সময় একদম কম থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই কম জিনিসের পরিবর্তন করে ঘর আকর্ষণীয় করে নিতে হবে। পর্দা বা সোফার কাভার-এর মতো বড় জিনিস বদলাতে না পারা গেলেও, থ্রো, রাগ বা ছোট কার্পেট ব্যবহার করা যেতে পারে, ফুলদানিতে শুকনো পাতা কিম্বা তাজা ফুল রাখা যেতে পারে, কমলালেবুর খোসা এ ভেজিটেবল ওয়েল দিয়ে নিমেষে তৈরি করা যেতে পারে সুগন্ধি মোমবাতির বিকল্প, শুকনো ফুল পাতা কিম্বা ফ্রেশ ফুল পাতা দিয়ে গারল্যান্ড তৈরি করে সদর দরজা সাজানো যায়। কমলালেবুর খোসা আর দারচিনি দিয়ে বানানো যায় নানান ধরনের সাজানোর জিনিস। কিংবা মোমবাতির চারপাশ। শীতের হোম মেকওভারের চটজলদি আরেকটা উপায় হল ল্যাম্পশেড আর বালব পাল্টানো, সাধারণ বালব বদলে ইনক্যান্ডিসেন্ট বালব লাগানো। এগুলো শুধু ওয়ার্ম আলো দেয় না, সত্যি সত্যি ঘর গরম করে তোলে। এভাবে ঘর সাজালে শীতের আমেজ অনুভব হবে ঘরের মধ্যেই।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com